নবীন বিজ্ঞানী

BANSDOC Library
Dhaka

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত
জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক ত্রৈমাসিক
প্রকাশকাল : মার্চ, ২০১৬

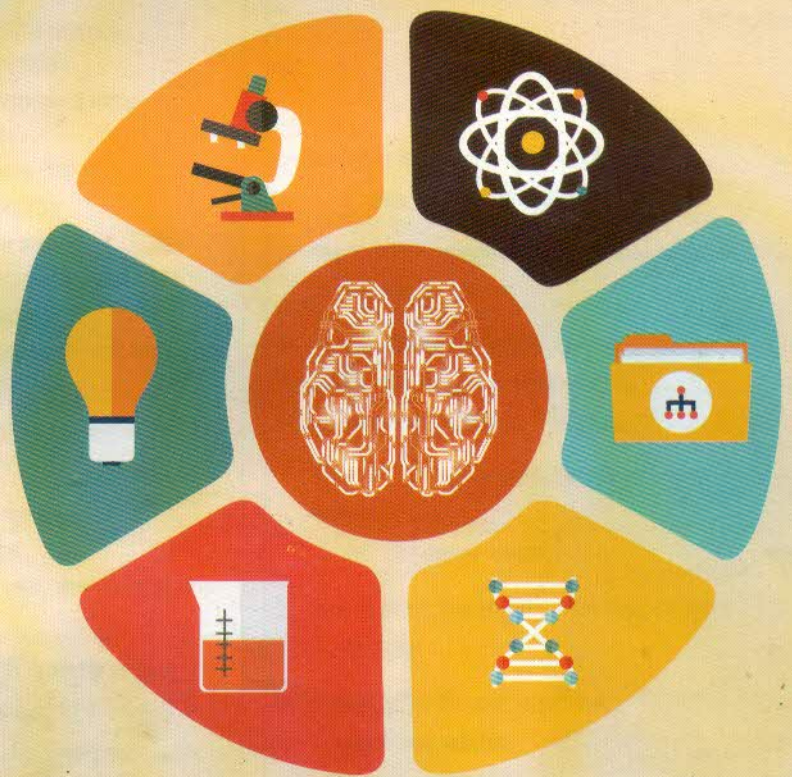

★ তরুণ প্রজন্ম : আত্মনির্ভরশীলতার নতুন সম্ভাবনা
★ "জুড়ে তব ওই আকাশখানা মেলেছি ও বিভু! পাখির দুই ডানা"
★ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : নতুন বিপ্লবের সূচনা
★ "জলবায়ু পরিবর্তন এবং বাংলাদেশ"

নবীন বিজ্ঞানী

জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক ত্রৈমাসিক

প্রকাশকাল : মার্চ, ২০১৬

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি :
জনাব স্বপন কুমার রায়
মহাপরিচালক

সম্পাদকমন্ডলী :
কাজী হাসিবুদ্দীন আহমেদ
কিউরেটর (সার্বিক)
জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম
লাইব্রেরিয়ান
জনাব মোঃ মোহসীন মোল্লা
সহকারী কিউরেটর
জনাব সৈকত সরকার
উপ-প্রধান ডিসপ্লে কর্মকর্তা
জনাব পপি মন্ডল
সহকারী লাইব্রেরিয়ান-কাম-ক্যাটালগার

প্রচ্ছদ :
জনাব সৌমিত্র কুমার বিশ্বাস
আর্টিস্ট

অঙ্গসজ্জা / মুদ্রণালয় :
অনুপম প্রিন্টার্স
৫ শ্রীশ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রকাশনায় :
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

যোগাযোগের ঠিকানা :
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭। ফোন : ৯১১২০৮৪
ই-মেইল : infonmst@gmail.com

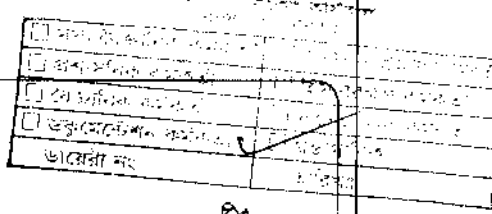

মহাপরিচালক

সূচিপত্র

- বাংলাদেশে গোল্ডেন রাইস গবেষণা — ১
  — ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া
- তরুণ প্রজন্ম : আত্মনির্ভরশীলতার নতুন সম্ভাবনা — ৪
  — মোঃ নজরুল ইসলাম
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর : ক্যাম্পাসে বিভিন্ন গাছ-গাছালি সম্পর্কে পরিচিতি — ৯
  — মোঃ কামরুল ইসলাম
- জুড়ে তব ওই আকাশখানা, মেলেছি ও বিভু! পাখির দুই ডানা — ২৩
  — মো. রিদওয়ানুর রহমান
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : নতুন বিপ্লবের সূচনা — ৩০
  — পপি মন্ডল
- জলবায়ু পরিবর্তন এবং বাংলাদেশ — ৩৫
  — নুরুন নাহার কবিতা

"নবীন বিজ্ঞানী" এর নিয়মাবলী

লেখক-লেখিকাদের জন্য

- রচনা বিজ্ঞানের যেকোনো বিষয়ে হতে পারে, তবে তা যেমন নবীনদের জন্য উপযোগী হতে হবে তেমনি তার ভাষা সহজ, সরল ও আকর্ষণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার স্পষ্টাক্ষরে লিখে বা টাইপ করে সম্পাদক বরাবর পাঠাতে হবে।
- অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হবে না।
- রচনার মৌলিকত্ব বজায় রেখে অংশবিশেষ পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন বা বর্জনের অধিকার সম্পাদকের থাকবে।
- রচনা মোটামুটি দুই থেকে তিন হাজার শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
- রচনার সাথে ছবি দিতে হলে সেসব ছবি লেখককেই সরবরাহ করতে হবে। হাতে আঁকা ছবি হলে পৃথক কাগজে সেটি সুন্দরভাবে চাইনিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে।
- ভুল তথ্য ও মতামতের জন্য লেখক দায়ী থাকবেন, সম্পাদক নয়।
- প্রকাশিত রচনার জন্য লেখককে সম্মানী দেয়ার ব্যবস্থা আছে।

সম্পাদক

"নবীন বিজ্ঞানী"

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১১২০৮৪

ই-মেইল : infonmst@gmail.com

নবীন বিজ্ঞানী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় সম্পাদক-এর সাথে যোগাযোগ করুন

মুখবন্ধ

মার্চ মাস বাঙালি জাতির স্বপ্নের স্বাধীনতার মাস। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও নিরলস প্রচেষ্টায় এবং ২৬ মার্চ, ১৯৭১ সালে তাঁহার অমোঘ ঘোষণায় এই জাতি স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। স্বাধীনতার ৪৫ বছরের মধ্যেই জাতির জনকের কন্যা বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ নিম্নমধ্য আয়ের দেশে পরিণত হইয়াছে। আশা করা যায়, তথ্য প্রযুক্তির সর্বাঙ্গীন ব্যবহারের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যেই এ দেশ একটি মধ্য আয়ের ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত হইবে। উন্নয়নের বর্তমান অগ্রযাত্রার অন্যতম হাতিয়ার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি। এ অভিযাত্রার তরুণ প্রজন্মকে অংশীদার করিবার লক্ষ্যে তাহাদেরকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রযাত্রার সাথে সম্পৃক্ত করিতে হইবে। এ উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপান্তরিত করিবার জন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর বিজ্ঞানের নানাবিধ তথ্য সম্বলিত ত্রৈমাসিক 'নবীন বিজ্ঞানী' সাময়িকীর মার্চ, ২০১৬ সংখ্যা প্রকাশ করিয়াছে। প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধসমূহ নবীন বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার ক্ষাণিক অংশ পূরণ করিলে এই প্রকাশনার উদ্যোগ সাফল্যমন্ডিত হইবে। প্রকাশনার জন্য প্রবন্ধ পাঠাইয়া প্রবন্ধকারগণ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরকে কৃতার্থ করিয়াছেন। যাহাদের একাগ্র পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ কর্মোদ্দীপনার ফসল হিসেবে প্রকাশনাটি আলোর মুখ দেখিয়াছে তাহাদের প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ।

স্বপন কুমার রায়
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

বাংলাদেশে গোল্ডেন রাইস গবেষণা

ড. মোঃ শহীদুর রশীদ ভূঁইয়া

বাংলাদেশের গোল্ডেন রাইস গবেষণা শুরুর যুগপূর্তি ঘটেছে। গোল্ডেন রাইস নিয়ে বেশ আলোচনা-সমালোচনা চলেছে এবং চলছে দেশে-বিদেশে। অনেক দিন ধরে এটি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকায় অবস্থা এমন হয়েছে যে, অনেকের ধারণা এদেশে বুঝি 'গোল্ডেন রাইস' আবাদ করা শুরু হয়েছে। আসলে গোল্ডেন রাইস গবেষণা এখনো শেষ হয়নি এবং এদেশে কেবল নয় পৃথিবীর কোনো দেশেই গোল্ডেন রাইস ধান জাত অবমুক্ত করা হয়নি। তবে বাংলাদেশসহ ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ায় ব্রি কর্তৃক তৈরি করা গোল্ডেন রাইস নিয়ে যে গবেষণা চলছে তা থেকে একটি জাত অবমুক্তির চেষ্টা যে চলছে তা বেশ স্পষ্টতই গোল্ডেন রাইস প্রকল্পের সাম্প্রতিক প্রয়াস থেকে অনুমান করা যাচ্ছে।

সাধারণভাবে কোনো ধান জাতেই ভিটামিন 'এ' তৈরি হয় না। অথচ পৃথিবীর বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রধান খাদ্য হলো ভাত। ফলে ধানের মধ্যে ভিটামিন 'এ' সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় জিন সন্নিবেশ করে মানুষের ভিটামিন 'এ'-এর চাহিদা মেটানোর আকাঙ্ক্ষা থেকে গোল্ডেন রাইস প্রকল্পের শুরু সেই ১৯৯০ থেকে। ডেফোডিল ফুল আর ব্যাকটেরিয়া থেকে জিন নিয়ে ধানে সংযোজন করে জিএম ধান লাইন তৈরি করা সম্ভব হয় ১৯৯৯ সালে। সুইস ফেডারেল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির ইনগো পট্রিক্যুস আর ইউনিভার্সিটি অব ফ্রেইসবার্গের পিটার বেয়ার ১৯৯৯ সালে গোল্ডেন রাইস ধান উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন। এখানে বলে রাখা দরকার, সে ধান ছিল জাপোনিকা উপ-প্রজাতি ধান। আমাদের দেশগুলোতে জন্মানো ইন্ডিকা উপ-প্রজাতির ধান ছিল না তা। ২০০০ সালে বিখ্যাত সায়েন্স জর্নালে এ উদ্ভাবনের বিস্তারিত প্রকাশিত হয়।

শুরুতে ডেফোডিল আর ব্যাকটেরিয়া থেকে জিন নিয়ে জাপোনিকা ধানে তা সংযোজন করে গোল্ডেন রাইস তৈরি করা হলেও পরবর্তীতে তা থেকে কোনো জাত অবমুক্ত করা সম্ভব হয়নি। এর অন্যতম কারণ হলো, সে সময় জাপোনিকা ধান জাতে সংযোজিত জিনগুলো যে পরিমাণ ভিটামিন 'এ' চালে তৈরি করতে পারত তা চাহিদার তুলনায় ছিল অনেক কম। ২০০৩ সালে গ্রিন হাউস অবস্থায় গোল্ডেন রাইসে প্রতি গ্রামে পাওয়া যায় ১.৬ মা. গ্রা. বিটা ক্যারোটিন। বিটা ক্যারোটিন থেকে তৈরি হয় ভিটামিন 'এ'। ২০০৪ সালে মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষায় গড়ে প্রতি গ্রাম দানায় পাওয়া যায় ৬ মা. গ্রা. বিটা ক্যারোটিন। মানবতার সেবায় গোল্ডেন রাইসের আবিষ্কারকদ্বয় উন্নয়নশীল দেশগুলোর দরিদ্র কৃষকদের কথা ভেবে গোল্ডেন রাইসের আরও অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে গোল্ডেন রাইস নিয়ে কাজ করার দায়িত্ব দেন প্রাইভেট বীজ কোম্পানি সিনজেন্টার হাতে। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে সিনজেন্টার বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে উন্নয়ন সাধন করা গোল্ডেন রাইস চলে যাবে পৃথিবীর বিভিন্ন পাবলিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে, সেটিই ছিল তাদের লক্ষ্য। সিনজেন্টার বিজ্ঞানীরা অতঃপর সে লক্ষ্যেই শুরু করেন পরবর্তী গবেষণা। লক্ষ্য ছিল তাদের দুটি: একটি হলো ডেফোডিলের বদলে মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় তেমন উদ্ভিদ থেকে একটি জিন নেওয়া এবং দ্বিতীয়টি হলো দানায় অধিক বিটা ক্যারোটিন তৈরি হয় তেমন জিএম ধান লাইন তৈরি করা। ২০০৫ সালে এসে নতুন এক রকম গোল্ডেন রাইস বিজ্ঞানীরা তৈরি করতে সক্ষম হন, যাতে ১৯৯৯ সালে উদ্ভাবিত গোল্ডেন রাইস অপেক্ষা ২৩ গুণ অধিক ক্যারোটিনয়েড তৈরি হয়। অর্থাৎ প্রতি গ্রাম দানায় তৈরি হয় ২৩ মা. গ্রা. ক্যারোটিনয়েড। আর বিটা ক্যারোটিন তৈরি হয় তাতে ১ গ্রামে ৩১ মা. গ্রাম পর্যন্ত। তার মানে, অনুমোদিত খাদ্য মাত্রায় ভিটামিন 'এ' পেতে হলে মানুষকে খেতে হবে ১৪৪ গ্রাম মাত্র গোল্ডেন রাইস।

ধান উৎপাদনকারী প্রধান দেশগুলোতে ইন্ডিকা ধানের আবাদ করা হয়ে থাকে বলে ইন্ডিকা ধানে গোল্ডেন রাইস পাওয়ার লক্ষ্যে জিন সংযোজন করা জরুরি হয়ে পড়ে। ইরি বিজ্ঞানীরা এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারায় তারা ইন্ডিকা ধানে ভিটামিন 'এ' উৎপাদন করার জন্য দায়ী জিন সংযোজন করার বিষয়টিকে গুরুত্ব

দেন তারা ইন্ডিকা ধান জাতে এ রকম জিন সংযোজন করে প্রাথমিকভাবে সফল হন। তাছাড়া তারা ডেফোডিলের বদলে নতুন গোল্ডেন রাইস তৈরিতে জিন নেন হলুদ দানাযুক্ত ভুট্টা আর ব্যাকটেরিয়া থেকে। সাধারণ ধান জাতে ভুট্টা থেকে ফাইটোইন সিনথেজ জিন, আর ব্যাকটেরিয়া থেকে ফাইটোইন ডিসেচ্যুরেজ জিন সংযোজন করে গোল্ডেন রাইস উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন বিজ্ঞানীরা। আমাদের জনপ্রিয় ধান জাত বিআর ২৯ জাতের ধান গাছে এসব জিন সংযোজন করে তৈরি করা হয়েছে গোল্ডেন ধান বিআর ২৯ গছ।

প্রথমবার যে গোল্ডেন ধান বিআর ২৯ গাছের বীজ দেওয়া হয় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের হাতে তা নিয়ন্ত্রিত গবেষণাগারে অর্থাৎ গ্রিন হাউসে জন্মানো হয় ২০০৬ সালে। ব্রি-এর বায়োটেকনোলজি বিভাগের বিজ্ঞানীরা মূলত সে গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। খুব একটা ভালো ফলাফল পাওয়া যায়নি সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে। গাছগুলোর বৃদ্ধি ও বিকাশ ততটা ভালো হয়নি তাছাড়া এদের ফলনও বিআর ২৯ ধান জাত গাছের তুলনায় খারাপ। ফলে প্রথমবারের গোল্ডেন রাইস নিয়ে খুব একটা এগোনো সম্ভব হয়নি বিজ্ঞানীদের। তাছাড়া এদের দানায় ভিটামিন 'এ' এর মাত্রাও ছিল কম।

পরবর্তীতে আবারও গোল্ডেন রাইসের জিন সন্নিবেশ করা হয় আমাদের বিআর ২৯ জাতের ধান গাছে। এ কাজটি করা হয় ইরিতে ইরি বিজ্ঞানীদের সহায়তায়। এ সময় যে ব্রিডিং লাইন পাওয়া যায় সেটি হলো GR2 R ইভেন্টের লাইন। এটি নিয়ে ব্রি বিজ্ঞানীরা কিন্তু নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বেশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল যে, পরীক্ষার ফলাফল বেশ আশাব্যাঞ্জক। এখন শেষ সময়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সমাপ্ত হলেই এ লাইনটিকে অবমুক্ত করার পরবর্তী ধাপ অতিক্রম করার জন্য আবেদন করা হবে বুঝি। অনেকটা বেশ হঠাৎ করেই গোল্ডেন রাইস প্রকল্পের ইরি প্রতিনিধি প্রদত্ত সেমিনারে থেকে জানা গেল যে, এ ব্রিডিং লাইনটির কৃষিতাত্ত্বিক দক্ষতা ও ফলাফল সমরূপ নয়, বরং তা বেশ অসমরূপ। ফলে এটি নিয়ে সামনে এগোবার আর সুযোগ থাকল না।

এবার অন্য আরেকটি ব্রিডিং লাইন নিয়ে ২০১৫ সালে দু'বার গ্রিন হাউসে এদের জন্মাবার পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করা হলো সেমিনারে। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশে বোরো মৌসুমে শতকরা ৬০-৭০ ভাগ অংশ দখল করা ব্রি ধান ২৯ এর ধানগাছে আবার ভিটামিন 'এ' জিন দুটি সংযোজন করা হয়েছে। এবারকার ইভেন্টের নাম দেওয়া হলো GR2 R ইভেন্ট। এক বছর নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে জন্মানোর পর যদি এ ব্রিডিং লাইনটি ব্রি ধান ২৯ এর সাধারণ জাতের সমান ফলন প্রদর্শন করে এবং যদি এর সকল বৈশিষ্ট্য ব্রি ধান ২৯ এর মতো হয়, তবে তা নিয়ে শুরু হবে অঞ্চলভিত্তিক বহুস্থানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। ২০১৮ সালে যেন এটি ছাড়করণ করা যায় সে লক্ষ্য নিয়ে এবার মাঠে নেমেছেন ত্রিদেশীয় এ প্রকল্পের বিজ্ঞানীগণ।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, গোল্ডেন রাইস আমাদের প্রয়োজন কেন? ভিটামিন 'এ' ঘাটতি বাংলাদেশের একটি মারাত্মক জনস্বাস্থ্য সমস্যা। আমাদের দেশে ছয় মাস থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের শতকরা ২২ জনের ভিটামিন 'এ' ঘাটতিজনিত সমস্যা রয়েছে। নারীদের মধ্যে বিশেষ করে গর্ভবতীদের মধ্যে ভিটামিন 'এ' ঘাটতি সমস্যা রয়েছে শতকরা ২৪ ভাগ। ফলে একদিকে তারা রাতকানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে অন্যদিকে দেহের প্রতিরোধী ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় শিশুদের সংক্রামক ব্যাধিজনিত মৃত্যু ঝুঁকি বাড়ছে।

ভিটামিন 'এ' ঘাটতি ঝুঁকি কমানোর জন্য বেশ কয়েকটি বিকল্প উপায় আমাদের সামনে রয়েছে অবশ্য। সেসব উপায়ের মধ্যে রয়েছে–

- খাদ্য বহুমুখীকরণ বা বৈচিত্র্যকরণ করে এ ঘাটতি কমিয়ে আনা যায়। এর জন্য খাদ্য হিসেবে নানা রকম বৈচিত্র্যময় উৎসজাত খাবার গ্রহণ করতে হবে।
- শিশুদের মাতৃদুগ্ধ পান করানো। তাহলে মায়েদের বৈচিত্র্যময় ও ভিটামিনসমৃদ্ধ খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে।

- ফসল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে খাদ্যে ভিটামিন 'এ'-এর পরিমাণ বৃদ্ধি করা। এটি যেমন ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ফসলের জাত বাছাই করে হতে পারে তেমনি তা জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসলে কাঙ্ক্ষিত জিন সংযোজনের মাধ্যমেও হতে পারে।
- খাদ্যের মধ্যে ভিটামিন 'এ' সংযোজিত করে দিতে হবে, যেন সে খাবার খেলে এর ঘাটতি না ঘটে

অনেকগুলো উপায় থাকলেও জিএম গোল্ডেন রাইস বিআর ২৯ জাত অবমুক্ত করা গেলে তা আমাদের জন্য যেসব সুবিধা নিয়ে আসতে পারে তা হলো–

- ভাত যেহেতু আমাদের প্রধান খাদ্য, ভাত খেলে এর মাধ্যমে আমাদের ভিটামিন 'এ' এর চাহিদা পূরণ হবে।
- জিন সংযোজনের মাধ্যমে ভিটামিন 'এ' উৎপাদন করা হয়েছে বিধায় এ জাত জন্মালেই চালে ভিটামিন 'এ' পাওয়া যাবে।
- বংশপরম্পরায় এ ধান জাত ভিটামিন 'এ' সৃষ্টি করতে থাকবে। প্রতিবছর এর বীজ না কিনেও কৃষক নিজের বীজ সংরক্ষণ করতে পারবেন।

তবে ধানের জিএম জাত অবমুক্তকরণে আমাদের খানিকটা বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতেই হবে। গোল্ডেন রাইস ধান বিআর ২৯ অবমুক্ত করার আগে যেসব বিষয় অবশ্যই নিশ্চিত হওয়া দরকার তা হলো–

- এসব ধান বীজে কতটুকু পরিমাণ ভিটামিন 'এ' থাকে। আর ভাত রান্না করার পর ভিটামিন 'এ' কতটুকু পাওয়া যায় তা জানা। আবার এর ভিটামিনের কতটুকু বা জীবগতভাবে দেহ পেয়ে থাকে তাও গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়। বিজ্ঞানীদের মতে, শেষ গোল্ডেন ব্রিডিং লাইনে ভিটামিন 'এ' এর মাত্রা ৫ পিপিএম তার চেয়ে কিছুটা বেশি।
- গোল্ডেন রাইসের ভাত জনস্বাস্থ্য বা প্রকৃতি ও পরিবেশ এবং অন্যান্য জীবকুলের উপর কোনো বিরূপ প্রভাব ফেলবে কিনা সেটি জানাও জরুরি। এখানে সংযোজিত জিনের যেসব প্রোটিন উৎপাদন করে এদের বিষাক্ত কোনো প্রভাব রয়েছে কিনা।
- ধানের খড় গৃহপালিত পশু খায়। আমরা আবার প্রাণিজ খাদ্য গ্রহণ করি। ফলে গোল্ডেন রাইসের খড়ে পুষ্টি উপাদানের কী তারতম্য হয় সেটিও একটি বিবেচ্য বিষয়।
- গোল্ডেন রাইসের ভাতের স্বাদ কী রকম হবে সেটিও একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভাতের স্বাদের তারতম্য কৃষক গ্রহণ করবে কতটুকু তাও ভাবতে হবে। তাছাড়া গোল্ডেন রাইসের পানি ভাতের অবস্থাই বা কী রকম হবে সেটিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

ভাত পৃথিবীর সিংহভাগ মানুষের প্রধান খাদ্য। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ধানের কোনো গোল্ডেন রাইস জাত পৃথিবীর কোথাও এখনো অবমুক্ত করা হয়নি। ধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফসল বলে যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর খাদ্যের গুণমান একটি পরিমিত মাত্রায় না পাওয়া পর্যন্ত ধানের জিএম জাত অবমুক্ত করা কিছুতেই ঠিক হবে না। বাংলাদেশে ২০১৭ সালে গোল্ডেন রাইস অবমুক্তির যে পথক্রম ধরে এগোচ্ছেন বিজ্ঞানীরা, সেটি কতটা যৌক্তিক সময়কাল সেটিও ভেবে দেখতে হবে। বিটি বেগুন অবমুক্ত হওয়ার আবেগে হুট করে জিএম ধান জাত অবমুক্ত করার ক্ষেত্রে খুব বেশি তাড়াহুড়ো করাও ঠিক হবে না। আমাদের সবদিক ভেবে-চিন্তে সকল নিয়মকানুন মেনে তবে এক্ষেত্রে এগোতে হবে। আর আমরা যেহেতু চাল রপ্তানিও কিছু করে থাকি ফলে জিএম জাত অবমুক্তকরণ আমাদের রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা সেটিও ভাবা একান্ত দরকার।

★ *প্রবন্ধকার শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক্স এন্ড প্লান্ট ব্রিডিং বিভাগের প্রফেসর এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো ভাইস-চ্যান্সেলর।*

তরুণ প্রজন্ম : আত্মনির্ভরশীলতার নতুন সম্ভাবনা

মোঃ নজরুল ইসলাম

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি জনবহুল উন্নয়নশীল দেশ। আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশই হলো তরুণসমাজ। তাদের ব্যতিরেকে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব নয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রশিক্ষিত তরুণসমাজের কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে তিনটি ধাপে। প্রথমে কৃষিনির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, যা ছিল মানুষের কায়িক পরিশ্রমের উপর নির্ভরশীল। এরপর শিল্পবিপ্লব নাম দিয়ে শুরু হয় শিল্পনির্ভর অর্থনীতির যাত্রা। এখানেও রয়েছে কায়িক শ্রম ও যান্ত্রিকতার মিশেল, যা আজও চলছে। তবে উন্নত দেশগুলো এ থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছে। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উন্নত দেশগুলোতে তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব নাম দিয়ে শুরু হয় জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতির যাত্রা। আজকের পৃথিবীতে যা ওয়েব বা ইন্টারনেটভিত্তিক অর্থনীতি হিসেবে সুপরিচিত। উন্নত দেশগুলো ওয়েবভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলায় প্রথমে গুরুত্ব দেয় প্রশিক্ষণের। শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের তথ্যপ্রযুক্তিতে উন্নত প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ইন্টারনেটভিত্তিক অর্থনীতির প্রসার ঘটছে অত্যন্ত দ্রুত।

একবিংশ শতাব্দীর এ সময়ে বলা হচ্ছে, যেসব দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাত বিকশিত সেসব দেশের অর্থনীতিও তত উন্নত। কাজের সুযোগও সেসব দেশে বেশী। বিশ্বায়নের এ সময়ে তথ্যপ্রযুক্তিতে যারাই বেশী অগ্রগামী তারাই উন্নয়নের ঝড় তুলছে। বর্তমান বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তি ছাড়া কোনো দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমরা যদি তথ্যপ্রযুক্তিতে অগ্রসরমান দেশগুলোর দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই সেসব দেশ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তির প্রয়োগ করে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ (বিসিজি) এক গবেষণায় বলেছে, ২০১৬ সালের মধ্যে জি-২০ দেশগুলোতে ওয়েবভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠবে। ২০১১ সালে জি-২০ ভুক্ত দেশে ওয়েবভিত্তিক অর্থনীতির পরিমাণ ছিল ২.৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০১৬ তে গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪.২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের অর্থনীতির দিকে তাকালে দেখতে পাই, তথ্যপ্রযুক্তির অবদান দেশটির অর্থনৈতিক ভিতকে অত্যন্ত সুদৃঢ় করেছে। বিসিজি'র গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের ইন্টারনেট অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে অত্যন্ত দ্রুত। ২০১৬ সালের মধ্যে ভারতে ইন্টারনেট অর্থনীতির আকার হবে ১০.৮ ট্রিলিয়ন রুপি বা ২১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিশ্বের প্রধান জি-২০ ভুক্ত দেশগুলোর ইন্টারনেট অর্থনীতির ক্রমোন্নতির তুলনায় অনেক দ্রুতগতির। ভারতের ইন্টারনেট অর্থনীতি বর্তমানে বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং এ খাতে কর্মসংস্থান হয়েছে ২০ লাখ মানুষের। তথ্যপ্রযুক্তিতে বিশ্ব যখন এগিয়ে চলছে তখন বাংলাদেশের অবস্থা কী সে সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

আইসিটিভিত্তিক অর্থনীতিতে বাংলাদেশের বাস্তবতা :

এ বছরের ২১ জানুয়ারি তথ্যপ্রযুক্তির অন্যতম দিকপাল বিল গেটসের একটি বক্তব্য ছাপা হয় বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা সিএনবিসিতে। এতে তিনি বলেন, "By 2035, there will be almost no poor countries left in the world." এ প্রসঙ্গে তিনি তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেন– (১) ডিজিটাল বিপ্লব; (২) ভেসিন উদ্ভাবন এবং (৩) উন্নত বীজ উদ্ভাবন।

এ তিনটি কারণে ২০৩৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যমুক্ত পৃথিবী গড়ে উঠবে। এতে প্রধান ভূমিকা পালন করবে ডিজিটাল বিপ্লব। বাংলাদেশ এ ডিজিটাল বিপ্লবে সামিল হয় ২০০৯ সালে। বর্তমান সরকার ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে রূপকল্প ২০২১ ঘোষণার মধ্য দিয়ে এ দেশের মানুষকে স্বপ্ন দেখায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনে ডিজিটাল বাংলাদেশ

বিনির্মাণের অঙ্গীকারটি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে। ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণের পর বর্তমান সরকারের প্রাধিকার কর্মসূচিতে স্থান পায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ। শুরু হয় তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার নবতর যাত্রা।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের স্তম্ভ হলো চারটি; যেমন–

১। মানবসম্পদকে একুশ শতকের উপযোগী করে গড়ে তোলা;
২। সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং অর্থপূর্ণভাবে নাগরিকদের সংযুক্ত করা;
৩। সকল নাগরিকের দ্বারপ্রান্তে সেবা পৌঁছে দেওয়া এবং
৪। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতসমূহ ও বাজার ব্যবস্থাকে আরও উৎপাদনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক করে গড়ে তোলা।

বিগত ৫ বছর ১০ মাসে সরকার এ চারটি স্তম্ভের লক্ষ্য পূরণে আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবারহ, অর্থব্যবস্থার ডিজিটাইজেশন, ৪ হাজার ৫৪৭টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, পৌরসভা ডিজিটাল সেন্টার ও সিটি করপোরেশনের অধীন ওয়ার্ড ডিজিটাল সেন্টার, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস, স্বাস্থ্য সেবার জন্য টেলিমেডিসিন সেন্টার, ২৫ হাজার ওয়েব পোর্টালের জাতীয় তথ্য বাতায়ন, জাতীয় ই-তথ্য কোষ, অংখ চাষীদের জন্য ই-পূর্জি চালুসহ বিভিন্ন সেবার ডিজিটাইজেশন করায় দেশের অধিকাংশ মানুষ এর সুফলভোগী। শুধুমাত্র ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকেই প্রতি মাসে ৪৫ লাখ মানুষ ৬০ ধরনের সেবা গ্রহণ করছে। এ সরকার পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তিবান্ধব পরিবেশ তৈরি করায় আইসিটি শিল্পের ইতিবাচক প্রভাব লক্ষণীয়। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) এর তথ্য মতে, ২০১২-১৩ অর্থবছরে শুধুমাত্র সফটওয়্যার রপ্তানি থেকে আয় হয় ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী বছরের রপ্তানি আয় থেকে প্রায় ৫০ শতাংশ বেশি। এ থেকে ধারণা করা যায়, ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সফটওয়্যার রপ্তানি আয় ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার খাত প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। ইতোমধ্যে আইটি সেবার মাধ্যমে ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজার সৃষ্টি হয়েছে এবং ৫০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে নানা উদ্যোগ বহির্বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে আমাদের ইতিবাচক ভাবমূর্তিকে তুলে ধরেছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার আমাদের জন্য অনন্য সম্মান বয়ে এনেছে। জাতিসংঘ সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড, ওয়ার্ল্ড সামিট অন ইনফরমেশন সোসাইটি অ্যাওয়ার্ড, ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যালায়েন্স অ্যাওয়ার্ড ও জাতিসংঘ সাউথ-সাউথ কো-অপারেশন ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড বাংলাদেশের ঘরে এসেছে। বাংলাদেশ সরকারের নিরলস পরিশ্রম ও কূটনৈতিক দক্ষতায় দ্বিতীয়বারের মতো আন্তর্জাতিক টেলি-কমিউনিকেশন ইউনিয়নের কাউন্সিল সদস্যপদ লাভ করে বাংলাদেশ। এরপরও আমাদের আইসিটিভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে, গড়ে তুলতে হবে দক্ষ মানবসম্পদ।

আইসিটিভিত্তিক উন্নয়নের ধাপ হলো চারটি :

আইসিটিভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের বিবেচনায় রয়েছে চারটি ধাপ। সে বিবেচনা থেকেই বিভিন্ন উদ্যোগ, প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে বিকশিত করার জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলছে। কারণ দক্ষ মানবসম্পদ ছাড়া তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিকাশ সম্ভব নয়। সরকারের পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে তাই দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

চার ধাপে যেভাবে কাজ হচ্ছে–

প্রথম ধাপ : তৃণমূলে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটে কম্পিউটার ও আইটি প্রশিক্ষিত মানুষ তৈরি করা হচ্ছে। আমরা যদি শুধু ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের কথা ধরি তবে দেখতে পাই, ৪৫৪৭টি ইউডিসি বিগত ৪ বছরে গ্রামে এক লাখেরও বেশি তরুণ-তরুণীকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, পলিটেকনিক, ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিবছর আরও বেশ কয়েক হাজার কম্পিউটার ও আইটি প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এসব কম্পিউটার ও আইটি প্রশিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের টার্গেট করেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে।

দ্বিতীয় ধাপ : প্রথম ধাপের এসব কম্পিউটার ও আইটি প্রশিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের টার্গেট করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলায় বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন করছে। ফ্রিল্যান্সার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং প্রকল্প এবং মোবাইল অ্যাপ তৈরিতে দক্ষ করে তোলার জন্য জাতীয় পর্যায়ে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে।

তৃতীয় ধাপ : ফ্রিল্যান্সার টু এনট্রাপ্রেনর (উদ্যোক্তা) তৈরি। বর্তমানে যেসব ফ্রিল্যান্সার তৈরি হচ্ছে তাদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে, যাতে একজন উদ্যোক্তা ২০ জনেরও অধিক ফ্রিল্যান্সারকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে পারেন।

চতুর্থ ধাপ : এনট্রাপ্রেনর টু বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (বিপিও)। দেশের সাত বিভাগ ও বেশ কয়েকটি জেলা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হাইটেক পার্ক নির্মাণ করেছে। ভবিষ্যতে সেখানে এসব উদ্যোক্তাদের বিপিও পেশাজীবী হিসিবে গড়ে তোলার সুযোগ করে দেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

এ চার ধাপের বিশ্লেষণ করলে আমার দেখতে পাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ দ্বিতীয় ধাপে লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং প্রকল্পের আওতায় ফ্রিল্যান্সার তৈরি হয়েছে, যা দেশের তরুণ-তরুণীদের ঘরে বসে আউটসোর্সিংয়ের কাজ করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠার ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। এ নিবন্ধে এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হচ্ছে।

আত্মনির্ভরশীলতায় আউটসোর্সিং খাত :

বর্তমানে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার গতি অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, আগামী এক দশকের মধ্যে বিশ্বে আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তির সংখ্যা হবে বর্তমান জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ। ঘরে বসে আয়ের পাশাপাশি আত্মনির্ভরশীল ও আপন পেশাগত দক্ষতা প্রদর্শনের সাহায্যে টাকা আয়ের মাধ্যমে নিজের ক্যারিয়ারকে বিকশিত করা যায় আউটসোর্সিংয়ের সাহায্যে। পরিবারের সবার কাছাকাছি থাকার মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধন আরও অটুট হয়। আর এক্ষেত্রে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত মাধ্যম হচ্ছে আউটসোর্সিং। সহজ আয়ের সেরা মাধ্যম হিসেবে এরই মধ্যে সমাদৃত হয়ে উঠেছে এটি। বহির্বিশ্বের কাজ কম্পিউটারের মনিটরে সাজিয়ে দিচ্ছে কয়েকটি মধ্যস্থতাকারী ওয়েবসাইট, যাদের বলা হচ্ছে মার্কেটপ্লেস। এ মার্কেটপ্লেসই হতে পারে আয়ের নতুন ঠিকানা। বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় এসব মার্কেটপ্লেসের মধ্যে রয়েছে মুক্ত পেশাজীবীদের কাজের সুযোগ। এখানে কাজ করে যে কেউ সফল হতে পারে। বিশ্বের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের অনেক কাজেই এখন বাইরের প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি দিয়ে করিয়ে নেয়। যুক্তরাষ্ট্র একাই বছরে প্রায় ৫০ হাজার কোটি ডলারের আউটসোর্সিং করছে। শুধুমাত্র ইল্যান্স-ওডেস্ক মার্কেট প্লেসে ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাজ রয়েছে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকলে যে কেউ কাজগুলো পেতে অংশ নিতে পারে।

তথ্যপ্রযুক্তির বহুবিধ ব্যবহার থেকে আয় বিশ্বের অনেক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশেষ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিরাট অবদান রাখছে। সারাবিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে প্রতিবছর আয় প্রায় এক হাজার বিলিয়ন ডলার। সফটওয়্যার রপ্তানি, প্রোগ্রামিং, আউটসোর্সিংসহ অনেক উৎস থেকে এ আয় হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি উৎস আউটসোর্সিং। আত্মনির্ভরশীল মানুষ গড়ে তোলায় আউটসোর্সিং খাত অপার সম্ভাবনা তৈরি করছে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। বর্তমানে বিশ্বে ৪২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের স্টাফিং মার্কেট রয়েছে, যার মাত্র ১০ শতাংশেরও কম অনলাইন মার্কেটে এসেছে। সময় এসেছে আউটসোর্সিংসহ অনলাইনভিত্তিক কাজের দ্রুত প্রসার ঘটানো এবং বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের স্টাফিং বাজারকে অনলাইনে বাজারে নিয়ে আসার। বাংলাদেশ এ বাজার ধরতে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।

তরুণদের সামনে অপার সম্ভাবনা :

বাংলাদেশ আউটসোর্সিংয়ের এ উৎসকে কাজে লাগিয়ে অর্থ উপার্জনকে উৎসাহিত করছে। ২০১২ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ দেশের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফ্রিল্যান্সার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য লার্নিং এন্ড আর্নিং কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং প্রথম পর্যায়ে প্রায় ১৫ হাজার ফ্রিল্যান্সার তৈরি করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে লার্নিং এন্ড আর্নিং প্রকল্পের অধীনে ৫৫ হাজার শিক্ষিত তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

বাংলাদেশের জন্য আউটসোর্সিংই হচ্ছে এ সময়ের সবচেয়ে টেকসই কর্মক্ষেত্র। শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের ওয়েব, গ্রাফিক্স ডিজাইন, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, সোশ্যাল মার্কেটিং, থিম ডিজাইন, প্রোগ্রামিং, ওয়েবসাইট ম্যানেজমেন্ট, লিংক বিল্ডিং, ডাটা এন্ট্রি টাইপিং, আর্টিক্যাল বা ব্লগ রাইটিং বিষয়ে প্রশিক্ষিত করবে লার্নিং এন্ড আর্নিং প্রকল্প।

বর্তমানে সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তি উদ্যোগে দেশে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক তরুণ-তরুণী আউটসোর্সিং উৎস থেকে আয় করার জন্য বিভিন্ন মার্কেটপ্লেসে নিবন্ধন করেছে। এদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি সক্রিয় ফ্রিল্যান্সার, যারা বছরে ৫০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি আয় করেছে। বাংলাদেশের তরুণ-তরুণীরা যে মার্কেটপ্লেসটিতে সবচেয়ে বেশি নিবন্ধন করেছে সেটি হচ্ছে ইল্যান্স-ওডেস্ক। এ মার্কেটপ্লেসটিতে নিবন্ধিত ফ্রিল্যান্সারের সংখ্যা সাড়ে চার লাখ। ২০১৩ সালে ইল্যান্স-ওডেস্ক থেকে আয় ২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী বছরের আয় থেকে ৩৫ শতাংশ বেশি। ২০১৪ সালে আয় ২০১৩ সালের ৩৫ শতাংশের প্রবৃদ্ধির চেয়েও বেশি হবে বলে আশা করছে ইল্যান্স-ওডেস্ক। বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সাররা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মার্কেটপ্লেসে আউটসোর্সিং কাজে শক্ত অবস্থান করে নেয়। ইল্যান্স-ওডেস্ক একীভূত হওয়ার পর বিশ্বের ১৮৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান ৭ম।

আউটসোর্সিংয়ে আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ক্রমশই সংহত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক শীর্ষ ব্যবস্থাপনা পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এটি কার্নির গ্লোবাল সার্ভিস লোকেশন (জিএসএল) সূচকে বিশ্বের ৫১'টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো ২৬তম অবস্থানে উঠে এসেছে। ২০১৪ সালে ১৯ সেপ্টেম্বর এটি কার্নির প্রতিবেদনে বলা হয়, আউটসোর্সিংয়ে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এর ফলে বিশ্বস্ততা এবং নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আউটসোর্সিং স্ট্যাটাসে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। আউটসোর্সিংয়ে এ অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে লার্নিং এন্ড আর্নিং প্রকল্প আত্মনির্ভরশীল মানুষ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

তরুণরাই গড়বে দেশ

ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরালে দেখা যায়, আমাদের সব অর্জন অদম্য তারুণ্যেরই জয়গাথা। তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে তারাই দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। নানা সৃষ্টিশীল উদ্যোগ, অর্জনে, কৃতিত্বে তারাই আমাদের জন্য নতুন আশার সঞ্চারক।

১১ নভেম্বর ২০১৪ জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ এখন ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণের সংখ্যা পৌনে পাঁচ কোটি। এর সঙ্গে ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়সী যুব জনসংখ্যাকে ধরলে বলা যায়, মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের দুই ভাগই টগবগে তরুণ। আর সিআইএ-দ্যা ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবুক' এর মতে যখন কোনো দেশের কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা আনুপাতিক হারে সবচেয়ে বেশি থাকে তখন একটি দেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টে বা জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বোনাসে প্রবেশ করে। ২০১২ সালে বাংলাদেশ এ ডেমোগ্রাফিক বোনাসে প্রবেশ করেছে। কর্মক্ষম মানুষের এ প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে আগামী আরও দুই দশক। ঠিক এরকম জনসংখ্যা সুবিধা নিয়েই ১৯৬৫ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে পূর্ব এশীয় টাইগার অর্থনীতির দেশগুলো উন্নতি করেছিল। চীন বিপ্লবের পরের উত্থানও ছিল অনেকটা তরুণদের রক্ত ও ঘামের ফসল। ষাটের দশকে দক্ষিণ কোরিয়াও একই রকম জনসংখ্যা সুবিধা অর্জন করেছিল। তারা একে কাজে লাগিয়ে আজ শিল্পসমৃদ্ধ দেশ। বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তি অগ্রগামী দেশের শীর্ষ তালিকায় স্থান করে নিয়েছে।

আশার কথা হচ্ছে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার। তার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টা খ্যাতিমান কম্পিউটার বিজ্ঞানী, বয়সে তরুণ, আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী সাংসদ, তারুণ্যের চিন্তা-চেতনার ধারক ও বুদ্ধিদীপ্ত। তাদের ভাবনায় রয়েছে আমাদের যুবশক্তিকে তথ্য প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত করে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা। বিশেষ করে যারা মোটামুটি শিক্ষিত এবং প্রতিবছর বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে বের হচ্ছে।

আমাদের প্রত্যাশা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ লার্নিং এন্ড আর্নিং, ফ্রিল্যান্সার টু এনট্রাপ্রেনর মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট, লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড গভর্নেন্স প্রকল্পের মতো দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির আরও অনেক কর্মসূচি চালু করে ঐসব তরুণ-তরুণীকে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসবে। এটি সম্ভব হলে ২০১৭ সালের মধ্যেই দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অবদান অন্তত ২০ শতাংশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। তখন শুধু আত্মনির্ভরশীল মানুষ নয়, বিশ্বে বাঙালিরা একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে উঠবে।

★ *প্রবন্ধকার মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ) এর প্রকল্প কর্মকর্তা ও বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের সদস্য।*

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর : ক্যাম্পাসে বিভিন্ন গাছ-গাছালি সম্পর্কে পরিচিতি

মোঃ কামরুল ইসলাম

ষাটের দশকে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বিশ্বময় বিজ্ঞানকেন্দ্র আন্দোলন শুরু হয়। এ সময় বিজ্ঞানী রবার্ট ও পেনহেইমারের ভাই ফ্রাঙ্ক-যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহরে বিশ্বের প্রথম বিজ্ঞান জাদুঘর গড়ে তোলেন। এ আন্দোলনের অংশ হিসেবে তৎকালীন সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৬৫ সালের ২৬ এপ্রিল ঢাকায় একটি বিজ্ঞান জাদুঘর স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৬৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর পাবলিক লাইব্রেরিতে প্রাথমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান জাদুঘরের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭০ সালের ১০ এপ্রিল বিজ্ঞান জাদুঘর শ্যামলীতে স্থানান্তরিত হয়; ১৯৭১ সালের ১৬ মে এটি ধানমন্ডির ১ নম্বর সড়কে স্থানান্তরিত হয়; ১৯৭৯ সালের ১ আগস্ট এটি ধানমন্ডির ৬ নম্বর সড়কে স্থানান্তরিত হয়; ১৯৮২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞান জাদুঘর ৯৫ নম্বর কাকরাইলে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৮৭ সালের ১ নভেম্বর সর্বশেষ রাজধানী ঢাকার শেরেবাংলা নগরের আগারগাঁও-এ নিজস্ব ভবনে বিজ্ঞান জাদুঘর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিজ্ঞান জাদুঘর যে মহান উদ্দেশ্যে নিবেদিত তা হলো বিজ্ঞান বিষয়ক বাস্তব ধারণা দিয়ে সর্বস্তরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করা। সে লক্ষ্যে বিজ্ঞান জাদুঘর বিভিন্ন কর্মকান্ড করে যাচ্ছে। সে বিষয়ে না গিয়ে শুধু বিজ্ঞান জাদুঘরের ক্যাম্পাসে যেসব গাছ-গাছালি রয়েছে তার নাম, বৈজ্ঞানিক নাম, উৎপত্তি ও ব্যবহার সম্পর্কে জনসাধারণকে ধারণা দেওয়ার জন্য নিচে সন্নিবেশিত হলো। বিজ্ঞান জাদুঘরের দর্শনার্থী ইচ্ছে করলে গাছ-গাছালি সম্পর্কে পরিচিত হতে পারেন।

সাধারণ নাম : **উলট কম্বল**
ইংরেজি নাম : Devils cotton
বৈজ্ঞানিক নাম : *Abroma augusta*
উৎপত্তি : মালয়ের আদিবাসী, বাংলাদেশে পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : মেয়েদের ঋতুস্রাবে অনিয়ম, তাছাড়া বেদনা কমাতে সাহায্য করে।

সাধারণ নাম : **শিশু (শিংশপী)**
ইংরেজি নাম : Sissoo
বৈজ্ঞানিক নাম : *Dalbergia sissoo*
উৎপত্তি : ভারত
গুণাগুণ : বমি বা দাস্ত হলে, ঋতুস্রাবে, মলের সঙ্গে রক্ত গেলে, মেদ হ্রসে এবং দূষিত ক্ষতে ও আসবাবপত্রের কাজে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ নাম : **নিম**
ইংরেজি নাম : Margosa Tree
বৈজ্ঞানিক নাম : *Azadirachta indica*
উৎপত্তি : ভারতে উৎপত্তি, তবে এশিয়ার সর্বত্র পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : ঔষধ হিসেবে নিমের জুড়ি নেই। খোস-পাঁচড়া, বসন্ত, হাম ও মাড়ির রক্তক্ষরণ হলে এটি ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ নাম : **বট**
ইংরেজি নাম : Banyan tree
বৈজ্ঞানিক নাম : *Ficus Bengalensis*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দেখা যায়
গুণাগুণ : অমাতিসারে নাক দিয়ে রক্ত পড়া, শুক্র তরলে শরীর জ্বালাপোড়া, স্ত্রীরোগে, ফেড়ায় ইত্যাদি

সাধারণ নাম : **পেঁপে**
ইংরেজি নাম : Papaya
বৈজ্ঞানিক নাম : *Carica papaya*
উৎপত্তি : পর্তুগিজের মাধ্যমে আমেরিকা
গুণাগুণ : কৃমিনাশক, আমাশয়, কেশ পরিষ্কারক, প্রবল জ্বর, একজিমা, উকুননাশক ইত্যাদি।

সাধারণ নাম : চালতা
ইংরেজি নাম : Elephant apple
বৈজ্ঞানিক নাম : *Dillenia Indica*
উৎপত্তি : বাংলাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে।
গুণাগুণ : টক হিসেবে, আচার বানানো এবং উন্নতমানের কয়লা তৈরি।

সাধারণ নাম : বটল ব্রাশ
ইংরেজি নাম : Bottle Brash
বৈজ্ঞানিক নাম : *Callistemon Lanceolatus*
উৎপত্তি : এশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে।
গুণাগুণ : গুচ্ছফুল, অতিরিক্ত সৌন্দর্যবর্ধন।

সাধারণ নাম : কাঁঠাল
ইংরেজি নাম : Jack Fuits
বৈজ্ঞানিক নাম : *Artocarpus hetrophyllus*
উৎপত্তি : মালয় ও ভারত।
গুণাগুণ : পুষ্টিগুণে পরিপূর্ণ, জেলি, জ্যাম তৈরিতে এবং কাঁচা কাঁঠাল তরকারি হিসেবেও খাওয়া যায়।

সাধারণ নাম : বোতল পাম
ইংরেজি নাম : Bottle Palm
বৈজ্ঞানিক নাম : *Roystonea regia*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়
গুণাগুণ : সৌন্দর্যবর্ধন, দৃষ্টিনন্দন, রাস্তার দুই পাশ সাজাতে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ নাম : আম
ইংরেজি নাম : Mango
বৈজ্ঞানিক নাম : *Mangifara Indica*
উৎপত্তি : বঙ্গ-ভারত উপমহাদেশে এর উৎপত্তি।
গুণাগুণ : আমের রস মুখরোচক, আচার ও জ্যাম-জেলি হিসেবে খাওয়া যায়।

সাধারণ নাম : আম (হীম সাগর)
ইংরেজি নাম : Mango
বৈজ্ঞানিক নাম : *Mangifara Indica*
উৎপত্তি : বঙ্গ-ভারত, উপমহাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : আমের রস, আচার ও জ্যাম-জেলি ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ নাম : কৃষ্ণচূড়া
ইংরেজি নাম : Krishnachura
বৈজ্ঞানিক নাম : *Delonix regia*
উৎপত্তি : মাদাগাস্কার ও দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকা
গুণাগুণ : শোভাবর্ধন গাছ হিসেবে এবং জ্বালানি ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যবহৃত হয় না।

সাধারণ নাম : আম রূপালী
ইংরেজি নাম : Mango
বৈজ্ঞানিক নাম : *Mangifara Indica*
উৎপত্তি : বঙ্গ-ভারত উপমহাদেশে এর উৎপত্তি।
গুণাগুণ : কাঁচা আম আচার, পাকা অবস্থায় তাজা খাওয়া যায়। জ্যাম, জেলি তৈরি হয়। আম দিয়ে বিভিন্ন পানীয় তৈরি করা যায়।

সাধারণ নাম : নারিকেল
ইংরেজি নাম : Coconut
বৈজ্ঞানিক নাম : *Cocos nucifera*
উৎপত্তি : মাদ্রাজ, উড়িষা ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে।
গুণাগুণ : কৃমিতে, কোষ্ঠবদ্ধতায়, অম্ল ও অজীর্ণ, পিত্তরোগে, দাঁতের মাড়ি ফোলায়, তেল হিসেবে, দড়ি, কুশন, জাজিম, পাপোস ইত্যাদি।

সাধারণ নাম : সুপারি
ইংরেজি নাম : Betel Nut
বৈজ্ঞানিক নাম : *Areca catechu*
উৎপত্তি : মালয়ের আদিবাসী, সাগর উপকূলে।
গুণাগুণ : পানের উপকরণ হিসেবে সুপারির ছাই দন্তরোগে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ নাম : বেলি
ইংরেজি নাম : Jasmin
বৈজ্ঞানিক নাম : *Jasminum duplex*
উৎপত্তি : এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে
গুণাগুণ : পাতা কেটে রস করে লাগালে ব্রণ দূর হয় এবং মুখ ফর্সা হয় ও সৌন্দর্য বর্ধন করে।

সাধারণ নাম : রঙ্গন
ইংরেজি নাম : Ixora
বৈজ্ঞানিক নাম : *Ixora coccinea*
উৎপত্তি : এশিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে।
গুণাগুণ : বাড়ির আঙ্গিনা ও অফিসের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

সাধারণ নাম : থুজা
ইংরেজি নাম : Thuja
বৈজ্ঞানিক নাম : *Thuja orientalis*
উৎপত্তি : বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে
গুণাগুণ : টবে, রাস্তার দুই ধারে, অফিসের সৌন্দর্য বর্ধনের কাজে ব্যবহার করা হয়।

সাধারণ নাম : জুঁই
ইংরেজি নাম : Jasmin
বৈজ্ঞানিক নাম : *Jasminum auriculatum*
উৎপত্তি : দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে।
গুণাগুণ : সুগন্ধি ও আতর হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

সাধারণ নাম : টিকোমা (ফুল)
ইংরেজি নাম : Tecoma
বৈজ্ঞানিক নাম : *T. grandiflora*
উৎপত্তি : ভারতসহ এশিয়া মহাদেশে।
গুণাগুণ : সৌন্দর্য বর্ধন হিসেবে।

সাধারণ নাম : জবা
ইংরেজি নাম : China rose
বৈজ্ঞানিক নাম : *Hibiscus rosa-sinensis*
উৎপত্তি : এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে।
গুণাগুণ : শনাক্তকরণে জবাফুল। জবাফুল হাতে ঘসলে হাত কেটে গেলে রক্ত বন্ধ হয়।

সাধারণ নাম : মুশান্ডা (সাদা)
ইংরেজি নাম : Mussaenda
বৈজ্ঞানিক নাম : *Mussaenda SP.*
উৎপত্তি : এশিয়ার বিভিন্ন দেশে।
গুণাগুণ : ঘন সন্নিবেশিত পাতা মনোহর।

সাধারণ নাম : গন্ধরাজ
ইংরেজি নাম : Jasmine
বৈজ্ঞানিক নাম : *Gadenia florida*
উৎপত্তি : পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশে।
গুণাগুণ : আতর, সুগন্ধি ও ঘর সাজাতে ব্যবহার করা হয়

সাধারণ নাম : কাঠ বাদাম
ইংরেজি নাম : Combrataceae
বৈজ্ঞানিক নাম : *Terminalia Catappa*
উৎপত্তি : উপকূলীয় অঞ্চলে জন্মায়।
গুণাগুণ : পাতা ও বাকল থেকে কালো কালি, বীজ থেকে তৈল পাওয়া যায়।

সাধারণ নাম : লালসালু
ইংরেজি নাম : Lalsalue
বৈজ্ঞানিক নাম : *Euphorbia cotinefolia*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়
গুণাগুণ : শোভাবর্ধন।

সাধারণ নাম : বকুল
ইংরেজি নাম : Indian Madlar
বৈজ্ঞানিক নাম : *Mimusopselengi Sp.*
উৎপত্তি : ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়।
গুণাগুণ : শ্বেতীরোগ, দাঁতের পোকায়, দাঁত পড়ায়, আমাশয়।

সাধারণ নাম : **অশোক**
ইংরেজি নাম : Asokatree
বৈজ্ঞানিক নাম : *Saraca Indica*
উৎপত্তি : দক্ষিণ ভারত, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম।
গুণাগুণ : চর্মরোগে, রক্তবন্ধে, তৃষ্ণা রোগে, স্নায়ুজাত বাতে ইত্যাদি।

সাধারণ নাম : **যয়তুন**
ইংরেজি নাম : Joyton
বৈজ্ঞানিক নাম : *Olea europea*
উৎপত্তি : ভারত ও আসাম
গুণাগুণ : ঔষধ হিসেবে।

সাধারণ নাম : **পেস্তা বাদাম**
ইংরেজি নাম : Pesta Batham
বৈজ্ঞানিক নাম : *Pistacia vera*
উৎপত্তি : দক্ষিণ ইউরোপ ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া।
গুণাগুণ : খাবার হিসেবে, আইসক্রিম ও কনফেকশনারিতে ব্যবহার করা হয়।

সাধারণ নাম : **জাফরান**
ইংরেজি নাম : Jafran
বৈজ্ঞানিক নাম : *Crocus Sativus*
উৎপত্তি : শীতপ্রধান দেশে এবং কাশ্মীর ও বেলুচিস্তানে ভালো জন্মে।
গুণাগুণ : সুগন্ধযুক্ত ফুলের জন্য এবং পোলাও, বিরিয়ানি রং করার জন্য।

সাধারণ নাম : **ক্রিসমাস ট্রি**
ইংরেজি নাম : Chrismas tree
বৈজ্ঞানিক নাম : *Aurocaria excelsa*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : যিশু ধর্মাবলম্বীদের অনুষ্ঠানে গাছটির বেশ কদর রয়েছে।

সাধারণ নাম : **বাতাবি লেবু (জাম্বুরা)**
ইংরেজি নাম : Lemon
বৈজ্ঞানিক নাম : *C. maxima*
উৎপত্তি : দক্ষিণ এশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া
গুণাগুণ : রক্ত পরিষ্কার, জন্ডিস, আমাশয়, রক্তহীনতায় বিশেষ উপকারী।

সাধারণ নাম : **ডালিম**
ইংরেজি নাম : Pomegranate
বৈজ্ঞানিক নাম : *Punica granatum*
উৎপত্তি : ইরাকে, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, দক্ষিণ এশিয়ায়।
গুণাগুণ : ফলের রস পুষ্টিকর, ভেষজ গুণসম্পন্ন হজমশক্তি বৃদ্ধি করে।

সাধারণ নাম : **আম (দেশি)**
ইংরেজি নাম : Mango
বৈজ্ঞানিক নাম : *Mangifara indica*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র, তবে উত্তরবঙ্গের চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও পাবনায় বেশি জন্মে।
গুণাগুণ : আম খুব সুস্বাদু, ঘরের আসবাবপত্র দরজা-জানালার কাজে ব্যবহার করা যায়।

সাধারণ নাম : **বিলিম্বী**
ইংরেজি নাম : Bilmbi
বৈজ্ঞানিক নাম : *Averrhoa bilimbi linn*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : ঔষধিগুণে পরিপূর্ণ গাছ।

সাধারণ নাম : **বাঁশ (চায়না)**
ইংরেজি নাম : Bamboo
বৈজ্ঞানিক নাম : *Dendrocalamus Sp.*
উৎপত্তি : চীন দেশে তবে বাংলাদেশের সর্বত্র বাঁশ পাওয়া যায়, তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায় বেশি জন্মে।
গুণাগুণ : বাঁশ ঘরের পালা, বেড়া, খাঁচা, কাগজ ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

সাধারণ নাম : **পেয়ারা (দেশি)**
ইংরেজি নাম : Guava
বৈজ্ঞানিক নাম : *Psidium guava*
উৎপত্তি : পোলিশ শব্দ Pera থেকে আগত।
গুণাগুণ : ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ ও সুস্বাদু ফল, জেলি, পনির, জ্যাম, খাদ্যসামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ নাম : পেয়ারা (কাজী)
ইংরেজি নাম : Guava
বৈজ্ঞানিক নাম : *Psidium guava*
উৎপত্তি : পোর্তুগিজ শব্দ Pera থেকে আগত। শীতপ্রধান অঞ্চলে এর বিস্তার।
গুণাগুণ : জ্যাম, জেলি এবং প্রচুর ভিটামিন 'সি' হিসেবে খাওয়া যায়।

সাধারণ নাম : মেহগনি (কাঠ)
ইংরেজি নাম : Mahagani
বৈজ্ঞানিক নাম : *Swietenia mahaniagani*
উৎপত্তি : নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এবং বাংলাদেশে পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : কাঠ হিসেবে দরজা-জানালা, বাদ্যযন্ত্র, রেললাইনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ নাম : লম্বু
ইংরেজি নাম : Lambo
বৈজ্ঞানিক নাম : *Swietenia Sp.*
উৎপত্তি : ভারত
গুণাগুণ : কাঠ হিসেবে এবং আসবাবপত্র হিসেবে।

সাধারণ নাম : মহুয়া
ইংরেজি নাম : Elopa tree
বৈজ্ঞানিক নাম : *Madhuca indica*
উৎপত্তি : বাংলাদেশসহ ভারতের প্রায় সব রাজ্যে।
গুণাগুণ : তেল পাওয়া যায়, কৃত্রিম ঘি, মাখন এবং সাবান তৈরিতে।

সাধারণ নাম : পান্থপাদক
ইংরেজি নাম : Travellers tree
বৈজ্ঞানিক নাম : *Ravenala madagascariensis*
উৎপত্তি : পান্থপাদক মাদাগাস্কারের প্রকৃত তরু।
গুণাগুণ : সৌন্দর্যের জন্য বিভিন্ন জায়গায় রোপণ করা হয়।

সাধারণ নাম : বাগান বিলাস
ইংরেজি নাম : Bouganvillea
বৈজ্ঞানিক নাম : *B. glabra*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : সৌন্দর্য বর্ধন, আতর ইত্যাদি

সাধারণ নাম : জাম (পাহাড়ি)
ইংরেজি নাম : Berry
বৈজ্ঞানিক নাম : *Eugenia jambolana*
উৎপত্তি : সমভূমি অঞ্চল, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে
গুণাগুণ : কৃষিজাত যন্ত্রপাতি, পেটের পীড়ায়, জামের বীজ থেকে তৈরি পাউডার ডায়াবেটিক রোগীর ঔষধ।

সাধারণ নাম : রয়েল পাম
ইংরেজি নাম : Royal Palm
বৈজ্ঞানিক নাম : *Oredoxa regia*
উৎপত্তি : মালয়েশিয়া
গুণাগুণ : তৈল, সাবানের উপকরণ তৈরি হয়।

সাধারণ নাম : বট (থাই)
ইংরেজি নাম : Banyan Tree
বৈজ্ঞানিক নাম : *Ficus Sp.*
উৎপত্তি : থাইল্যান্ড
গুণাগুণ : আমাতিসারে, শুক্র তরলে, নাক দিয়ে রক্ত পড়া।

সাধারণ নাম : তুলসী
ইংরেজি নাম : Basil plant
বৈজ্ঞানিক নাম : *Ocimum sanctum*
উৎপত্তি : দেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : সর্দিজ্বর, ব্রঙ্কাইটিস রোগে, জ্বর, কৃমিনাশক, আমাশয়, গ্যাস্ট্রিক, অজীর্ণ।

সাধারণ নাম : কফি
ইংরেজি নাম : Coffee
বৈজ্ঞানিক নাম : *Coffee Sp.*
উৎপত্তি : দক্ষিণ ভারত কফির সম্রাট
গুণাগুণ : শারীরিক ক্লান্তি, মনের আনন্দদায়ক, কফনাশক, আমাশয়, মাথাধরা, জ্বর।

সাধারণ নাম : **শতমূলী**
ইংরেজি নাম : Satamuli
বৈজ্ঞানিক নাম : *Asparagus officinalis*
উৎপত্তি : কাফকা প্রদেশে, বাংলাদেশ, ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলে।
গুণাগুণ : স্বপ্নদোষ, রক্ত দূষিত, রাতকানা, মায়ের বুকের দুধ বাড়তে ইত্যাদি।

সাধারণ নাম : **পাথরকুচি**
ইংরেজি নাম : Pathorkuchi
বৈজ্ঞানিক নাম : *Kalanchoe pinnata*
উৎপত্তি : বাংলাদেশসহ এশিয়ার সর্বত্র।
গুণাগুণ : হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, পাইলস, গ্যাস্টিক, স্টেফাঁপা এসব রোগের ক্ষেত্রে ভালো ফল পাওয়া যায়; হোমিওপ্যাথি ঔষধ নামক নাক্সভোম তৈরি হয় পাথরকুচি পাতা থেকে।

সাধারণ নাম : **সর্পগন্ধা**
ইংরেজি নাম : Sarpagandha
বৈজ্ঞানিক নাম : *Rauvolfia serpentina*
উৎপত্তি : ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে।
গুণাগুণ : মৃগীরোগজনিত মূর্ছা, সর্পদংশন, উচ্চ রক্তচাপ, স্নায়ুবিক উত্তেজনায়

সাধারণ নাম : **বাসক**
ইংরেজি নাম : Gendarussa vulgaris
বৈজ্ঞানিক নাম : *Adhatoda vasica*
উৎপত্তি : নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের দেশে পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : সর্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস ও হাঁপানি ইত্যাদি রোগে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ নাম : **পাহাড়ি ফুল**
ইংরেজি নাম : Pahari flower
বৈজ্ঞানিক নাম : *Brownea*
উৎপত্তি : পাহাড়ি অঞ্চলে পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : সৌন্দর্য বর্ধন।

সাধারণ নাম : **জাত কানশিরা**
ইংরেজি নাম : Jatkansira
বৈজ্ঞানিক নাম : *Commelina erecta linn*
উৎপত্তি : এশিয়ার সর্বত্র পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : ঔষধী গুণসম্পন্ন উদ্ভিদ।

সাধারণ নাম : **ঝাউ**
ইংরেজি নাম : Conifers/Jhau
বৈজ্ঞানিক নাম : *Casuarina littorea lour*
উৎপত্তি : অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দা।
গুণাগুণ : বাগানের শোভাবর্ধন করে, উদ্যান ও রাস্তার পাশে লাগানো হয়।

সাধারণ নাম : **তুতগাছ**
ইংরেজি নাম : Silk worms/Tutghach
বৈজ্ঞানিক নাম : *Morusalba Linn*
উৎপত্তি : উত্তর অঞ্চলে বেশি পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : আঁশ, বস্ত্রশিল্পে, পিত্ত ও কফনাশক, ফলের রসপিপাসা নিবারক।

সাধারণ নাম : **কামরাঙ্গা**
ইংরেজি নাম : Karambola apple
বৈজ্ঞানিক নাম : *Averrhoa carambola*
উৎপত্তি : আমেরিকা
গুণাগুণ : ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে, কাশের জন্য উপকারী।

সাধারণ নাম : **কদম**
ইংরেজি নাম : Kadamba
বৈজ্ঞানিক নাম : *Arthocephalus cadamba*
উৎপত্তি : ভারতে এর উৎপত্তি। পাহাড়ি বনাঞ্চলে, নদীর পাদদেশে।
গুণাগুণ : প্লাইউড ও ম্যাচ ফ্যাক্টরিতে, কাগজের মণ্ড তৈরি বা ফল থেকে ঔষধ, কদম ফল খাওয়া যায়।

সাধারণ নাম : জাম (দেশি)
ইংরেজি নাম : Berry
বৈজ্ঞানিক নাম : *Eugenia jambolana*
উৎপত্তি : বাংলাদেশ ও ভারতের সমভূমি ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে।
গুণাগুণ : জামের বীজ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে, রক্তশোধক, কফ ও পিত্ত নিবারক।

সাধারণ নাম : একাশিয়া (কাঠ গাছ)
ইংরেজি নাম : Acacia
বৈজ্ঞানিক নাম : *Acacia decurrans*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : ঔষধি গুণে পরিপূর্ণ।

সাধারণ নাম : শীল কড়ই
ইংরেজি নাম : Shilkorori
বৈজ্ঞানিক নাম : *Albizzia odoratissima*
উৎপত্তি : এশিয়ার সর্বত্র।
গুণাগুণ : ঘর ও বিভিন্ন প্রকার খাট, চেয়ার, টেবিল, দরজা, জানালা নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ নাম : বহেরা
ইংরেজি নাম : Boyhara
বৈজ্ঞানিক নাম : *Terminalia belerica*
উৎপত্তি : ভারতসহ, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : চুল উঠা, শ্বাসকষ্ট, কৃমি দূর হয়।

সাধারণ নাম : হরীতকী
ইংরেজি নাম : Haritaki
বৈজ্ঞানিক নাম : *T. chebula*
উৎপত্তি : দেশের সর্বত্র পাওয় যায়।
গুণাগুণ : কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে, কুষ্ঠ রোগ ও বমির ভাব দূর করে।

সাধারণ নাম : বেত
ইংরেজি নাম : Ratta
বৈজ্ঞানিক নাম : *Calamusdraco*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সিলেট ও আসামে
গুণাগুণ : ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, কুলা, ঝুড়া, পাতি, ঘরের বেড়া বাঁধা ও অন্যান্য জিনিস তৈরি হয়।

সাধারণ নাম : ইউকেলিপ্টাস
ইংরেজি নাম : Lemon scented Eucalyptus
বৈজ্ঞানিক নাম : *Eucalyptus citriodora*
উৎপত্তি : ভারত, অস্ট্রেলিয়া।
গুণাগুণ : বৈদ্যুতিক খুঁটি, কাগজের মণ্ড, প্লাইউড, প্যাকিং কেস ইত্যাদি।

সাধারণ নাম : এরারুট গাছ
ইংরেজি নাম : Araroot
বৈজ্ঞানিক নাম : *Curcuma angustifolia Roxb*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : ঔষধি গুণে পরিপূর্ণ

সাধারণ নাম : রিটা
ইংরেজি নাম : Rattha
বৈজ্ঞানিক নাম : *Sapindus saponaria*
উৎপত্তি : ভারতসহ এশিয়া অঞ্চলে।
গুণাগুণ : ঔষধি গুণে পরিপূর্ণ।

সাধারণ নাম : সোনালি (বান্দরলাঠি)
ইংরেজি নাম : Sonali
বৈজ্ঞানিক নাম : *Cassia fistula*
উৎপত্তি : এশিয়ায় পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : শিশুরা ফল মিষ্টি হিসেবে খেয়ে থাকে।

সাধারণ নাম : পাতাবাহার
ইংরেজি নাম : Croton
বৈজ্ঞানিক নাম : *Codiaeum variegatum*
উৎপত্তি : পৃথিবীর সর্বত্র।
গুণাগুণ : গৃহ সাজাতে, রাস্তার পার্শ্ব, বারান্দার সৌন্দর্য।

সাধারণ নাম : চেরি
ইংরেজি নাম : Cherry
বৈজ্ঞানিক নাম : *Lagerstroemia indica*
উৎপত্তি : ভারত ও এশিয়ায়।
গুণাগুণ : সৌন্দর্য বর্ধন ও ফল খাওয়া যায়

সাধারণ নাম : **অগ্নিশিখা**
ইংরেজি নাম : Agnishikha
বৈজ্ঞানিক নাম : *Gloriosa sperba Linn*
উৎপত্তি : এশিয়ায় এর উৎপত্তি।
গুণাগুণ : ঔষধি গুণে পরিপূর্ণ

সাধারণ নাম : **কাটা মেহেদি**
ইংরেজি নাম : Hena
বৈজ্ঞানিক নাম : *Lawsonia inermis*
উৎপত্তি : ভারতবর্ষের আদিবাসী।
গুণাগুণ : তন্তু ও চামড়া শিল্পে ব্যবহৃত হয়, বিয়েতে হাতে রাঙানো, চুল, দাড়ি রং করা ইত্যাদি

সাধারণ নাম : **করমজা**
ইংরেজি নাম : Indian Buch
বৈজ্ঞানিক নাম : *Pongamia pinnata merr*
উৎপত্তি : সমুদ্রের পাড় বা দ্বীপাঞ্চলের বিল বা হাওরে চিরসবুজ গাছ। ভারতসহ এশিয়া অঞ্চলে
গুণাগুণ : টক হিসেবে খাওয়া যায়। চর্মরোগ ও কাশিতে ব্যবহৃত

সাধারণ নাম : **নীল**
ইংরেজি নাম : Indigo
বৈজ্ঞানিক নাম : *Stobolanthes sp.*
উৎপত্তি : ফরাসি ও ব্রিটিশ
গুণাগুণ : এটি রংয়ের রাজা, বিভিন্ন ধরনের পেইন্টের কাজে ব্যবহৃত হয়

সাধারণ নাম : **চন্দন**
ইংরেজি নাম : The famous fragrant wood/ Sandal
বৈজ্ঞানিক নাম : *Pterocarpus santalinus*
উৎপত্তি : পূর্ব ভারতের আদিবাসী
গুণাগুণ : চামড়া শিল্প, কাপড় ও কাঠশিল্পে ব্যবহৃত হয়

সাধারণ নাম : **ছাইতুন/ছাতিয়ান**
ইংরেজি নাম : Devels tree
বৈজ্ঞানিক নাম : *Alstonia scholares. R. Br.*
উৎপত্তি : বাংলাদেশসহ ভারত, মেদিনীপুর, বীরভূম ইত্যাদি অঞ্চলে।
গুণাগুণ : দাঁতের পোকায়, অম্লশয় ও বুকের দুধ কমলে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ নাম : **ইলিয়া**
ইংরেজি নাম : Ilia
বৈজ্ঞানিক নাম : *Elatostema papilosum*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : কাঠ ও ঔষধি গুণে পরিপূর্ণ।

সাধারণ নাম : **গামারি (কাঠ গাছ)**
ইংরেজি নাম : Candahar tree
বৈজ্ঞানিক নাম : *Gmelina arborea*
উৎপত্তি : চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট ও মধুপুর।
গুণাগুণ : গৃহনির্মাণ, আসবাবপত্র, সাম্পান তৈরিতে।

সাধারণ নাম : **নাগেশ্বর**
ইংরেজি নাম : Iron wood
বৈজ্ঞানিক নাম : *Mesua ferrea*
উৎপত্তি : চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমিতে পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : খাম, খুঁটি, নির্মাণ কাজ, আতর তৈরি, সুগন্ধি সাবান তৈরিতে ব্যবহৃত হয়

সাধারণ নাম : **চিরতা (ঔষধি)**
ইংরেজি নাম : Chirata
বৈজ্ঞানিক নাম : *Anethum graveolens*
উৎপত্তি : ভারতসহ এশিয়ায়।
গুণাগুণ : কৃমি, ব্রন এবং কুষ্ঠরোগ উপকারী।

সাধারণ নাম : **পানকর্পূর**
ইংরেজি নাম : Camphor
বৈজ্ঞানিক নাম : *Cinnamomum camhora*
উৎপত্তি : ভারত ও বাংলাদেশে পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : গাছ হতে কর্পূর উৎপন্ন হয়, সর্দি, ব্যথা ও জ্বালা নিবারণ করে।

সাধারণ নাম : এরিকা পাম
ইংরেজি নাম : Palm
বৈজ্ঞানিক নাম : *Areca Lutescens*
উৎপত্তি : বাংলাদেশসহ এশিয়া অঞ্চলে।
গুণাগুণ : সৌন্দর্য বর্ধন।

সাধারণ নাম : খেজুর
ইংরেজি নাম : Date tree
বৈজ্ঞানিক নাম : *Phoenix sylvestris*
উৎপত্তি : ভারতীয় উপমহাদেশে ও আরবীয় অঞ্চলে
গুণাগুণ : রস সুস্বাদু, নেশাজাতীয় দ্রব্য তৈরি হয়, এতে শর্করা ও আমিষ থাকে ৫-৭% গাজন প্রক্রিয়ায় অ্যালকোহল তৈরি হয়।

সাধারণ নাম : রাধাচূড়া
ইংরেজি নাম : Radhachura
বৈজ্ঞানিক নাম : *Caesalpinia pulcherrima sweet*
উৎপত্তি : এশিয়া অঞ্চলে।
গুণাগুণ : কাঠ ও ঔষধি গুণে পরিপূর্ণ।

সাধারণ নাম : দুধরাজ
ইংরেজি নাম : Milk tree
বৈজ্ঞানিক নাম : *Drynaria Sp.*
উৎপত্তি : ভারতের পশ্চিমবঙ্গে।
গুণাগুণ : অবিরাম জ্বর, বিষাক্ত ক্ষত, মুখের ঘা, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগে।

সাধারণ নাম : কালো ধুতরা
ইংরেজি নাম : Black Dhutura/Thorn Apple
বৈজ্ঞানিক নাম : *Datura Metal Linn*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : খাতরোগে, চুলকানি, জন্ডিস, রক্ত আমাশয়।

সাধারণ নাম : ডুমুর
ইংরেজি নাম : Dumur
বৈজ্ঞানিক নাম : *Ficus Hispida*
উৎপত্তি : গ্রামাঞ্চলে নদীর পাশে দেখা যায়।
গুণাগুণ : তরকারি হিসেবে খাওয়া যায় ক্ষয়রোগ ও ডায়াবেটিস ঔষধ হিসেবে

সাধারণ নাম : কাঞ্চন গাছ
ইংরেজি নাম : Kanchan
বৈজ্ঞানিক নাম : *Bauhinia Splendens*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়, উদ্যান ও রাস্তার পাশে পাওয়া যায়
গুণাগুণ : শোভা বর্ধনকারী ফুলের গাছ হিসেবে লাগানো হয়।

সাধারণ নাম : মেহেদি
ইংরেজি নাম : Henna
বৈজ্ঞানিক নাম : *Lawsonia Sp.*
উৎপত্তি : পৃথিবীর সর্বত্র পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : হাত, পা রাঙানোর কাজে, শরীরে কাটাছেঁড়া স্থানে মেহেদি লাগালে উপকার পাওয়া যায়।

সাধারণ নাম : গাব (বিলাতি)
ইংরেজি নাম : River ebony
বৈজ্ঞানিক নাম : *Diospyros peregrina Gaertn*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : পাকা ফল খাওয়া যায় এবং জ্বালে কলপ দিতে, বই বাইন্ডিং-এর গ্লু হিসেবে ব্যবহৃত হয়

সাধারণ নাম : সেগুন
ইংরেজি নাম : Teak
বৈজ্ঞানিক নাম : *Tectona grandis Linn*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়
গুণাগুণ : আসবাবপত্র তৈরির জন্য উত্তম কাঠ, রেলের বগি, পাইলিং এবং বাকল থেকে হলুদ রং তৈরি হয়।

সাধারণ নাম : আমলকী
ইংরেজি নাম : Amla, Indian Gooseberry
বৈজ্ঞানিক নাম : *Phyllanthus emblica linn*
উৎপত্তি : বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা ও চীনে আমলকীর বিস্তার রয়েছে।
গুণাগুণ : হৃদযন্ত্র ও মস্তিষ্কের শক্তি বর্ধন, বমি, পিপাসা নিবারক ও ভিটামিন 'সি' হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ নাম : হুডি আদা
ইংরেজি নাম : Ginger
বৈজ্ঞানিক নাম : *Zingiber of officinale*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র, তবে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিক পাওয়া যায়
গুণাগুণ : সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, আমাশয়, অজীর্ণ, অশ্বরোগ দূর করে।

সাধারণ নাম : গর্জন
ইংরেজি নাম : Garjan
বৈজ্ঞানিক নাম : *Dipterocarpus turbenatus*
উৎপত্তি : চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট
গুণাগুণ : ফ্রেম, দরজা, জানালা ও আসবাবপত্র তৈরি।

সাধারণ নাম : কমলা
ইংরেজি নাম : Orange
বৈজ্ঞানিক নাম : *Citrus reticulata*
উৎপত্তি : দক্ষিণ ইন্দোচীন ও বাংলাদেশে পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : পানীয়, সুগন্ধি ও ঔষধ হিসেবে।

সাধারণ নাম : রেইনট্রি
ইংরেজি নাম : Rain tree
বৈজ্ঞানিক নাম : *Enterolobium saman prain*
উৎপত্তি : দক্ষিণ ব্রাজিল
গুণাগুণ : মূলত জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

সাধারণ নাম : অর্জুন
ইংরেজি নাম : White murdah
বৈজ্ঞানিক নাম : *Terminalia arjuna*
উৎপত্তি : দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, রাস্তার পার্শ্বে
গুণাগুণ : হৃদরোগের মহৌষধ, ছালের বাকলের সাথে দুধ মিশিয়ে খেলে হৃৎপিন্ড শক্তি বৃদ্ধি করে।

সাধারণ নাম : দেবদারু (উইপিং)
ইংরেজি নাম : Debdaru
বৈজ্ঞানিক নাম : *Polyalthea longifolia*
উৎপত্তি : ভারত
গুণাগুণ : শোভাবর্ধক, তোরণ নির্মাণে, দিয়াশলাই শিল্পে ও কাগজের মন্ড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ নাম : পেয়ারা (কাজী)
ইংরেজি নাম : Guava
বৈজ্ঞানিক নাম : *Psidium guajava*
উৎপত্তি : দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের উত্তর অঞ্চলে।
গুণাগুণ : পেয়ারা পরিবেশ আপেল, ভিটামিনসমৃদ্ধ, পাতা আমাশয় নিরাময় করে।

সাধারণ নাম : পলাশ
ইংরেজি নাম : Parrot tree
বৈজ্ঞানিক নাম : *Butea monosperma kuntze*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র এ গাছ রাস্তার পাশে দেখা যায়।
গুণাগুণ : কৃমির জন্য ছালের রস, কাঠ থেকে কাঠ কয়লা তৈরি, এ গাছ প্রধানত লাক্ষা চাষে ব্যবহৃত হয়। ফুল থেকে হলুদ রং পাওয়া যায়।

সাধারণ নাম : গোলাপ জাম
ইংরেজি নাম : Rose Apple
বৈজ্ঞানিক নাম : *Syzygum jambos*
উৎপত্তি : দক্ষিণ এশিয়াতে ফলটি জন্মলাভ করে।
গুণাগুণ : অম্লাধিক্য, খুটি ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ নাম : আম (আশ্বিনা)
ইংরেজি নাম : Mango
বৈজ্ঞানিক নাম : *Mangifara indica*
উৎপত্তি : ভারতসহ বাংলাদেশের সর্বত্র।
গুণাগুণ : স্নায়ু, পিত্ত, কফ, ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়, তৃষ্ণা ও ক্লান্তি অবসান এবং চর্বি কমে।

সাধারণ নাম : লিচু (বোম্বাই)
ইংরেজি নাম : Lichi
বৈজ্ঞানিক নাম : *Lichi chinensis*
উৎপত্তি : বোম্বে ও বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : অধিক মিষ্টি, সুগন্ধিযুক্ত।

সাধারণ নাম : লিচু (চায়না-৩)
ইংরেজি নাম : Lichi
বৈজ্ঞানিক নাম : *Lichi isinensis*
উৎপত্তি : কোচিন ও শ্যাম দেশের অধিবাসী। বিশেষ করে চীন দেশেই এর উৎপত্তি।
গুণাগুণ : প্রচুর লোহা, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস আছে।

সাধারণ নাম : কামিনী
ইংরেজি নাম : Kamini
বৈজ্ঞানিক নাম : *Murraya panichulata*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : শোভা বর্ধন এবং ফুলের সুবাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ নাম : হাসনাহেনা
ইংরেজি নাম : Hasnahena
বৈজ্ঞানিক নাম : *Cestrum noctumum*
উৎপত্তি : জাপান
গুণাগুণ : সুগন্ধি, চতুর্দিকে গন্ধ ছড়ায়।

সাধারণ নাম : শরীফা ফল
ইংরেজি নাম : Custard Apple
বৈজ্ঞানিক নাম : *Anona squamosalinn*
উৎপত্তি : ভারত
গুণাগুণ : আমাশয়, ফোড়ায়, মূর্ছা রোগে।

সাধারণ নাম : থাই লিচু
ইংরেজি নাম : Lichi
বৈজ্ঞানিক নাম : *Lichi chinensis*
উৎপত্তি : কোচিন ও শ্যাম দেশের অধিবাসী
গুণাগুণ : প্রচুর লোহা, ফসফরাস থাকে, জেলি হিসেবে খাওয়া যায়।

সাধারণ নাম : আতাফল
ইংরেজি নাম : Apple
বৈজ্ঞানিক নাম : *Anona reticulata*
উৎপত্তি : ভারত ও আমেরিকা।
গুণাগুণ : মূর্ছা রোগে, উকুননাশে, ফোড়ায়, আমাশয় ও অপুষ্টিজনিত রোগে।

সাধারণ নাম : কুল
ইংরেজি নাম : Jujube Fruit
বৈজ্ঞানিক নাম : *Zieiphus jujuba*
উৎপত্তি : এশিয়া ও আফ্রিকায়।
গুণাগুণ : আচার, চাটনি, মোরব্বা করে খাওয়া যায়। প্রচুর ভিটামিন 'সি' থাকে ও ক্ষতরোগে উপকারী।

সাধারণ নাম : এলাচি লেবু
ইংরেজি নাম : Alachi lebu
বৈজ্ঞানিক নাম : *Citrus Jambhiri linn*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : লেবু ভিটামিন 'সি' এর উৎস। অরুচি, ক্ষুধামন্দায় লেবু খুব ভালো কাজ করে।

সাধারণ নাম : কাগজি লেবু
ইংরেজি নাম : Kagaji lebu
বৈজ্ঞানিক নাম : *Citrus aurantifolia linn*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়
গুণাগুণ : নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে, বাংলাদেশেও জনপ্রিয় ফল রস উপকারী বলে ভাতের সাথে কিংবা শরবতের মিশ্রণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

সাধারণ নাম : আমড়া
ইংরেজি নাম : Hugplum
বৈজ্ঞানিক নাম : *Spondias mangifera*
উৎপত্তি : বাংলাদেশ ও ভারতে এর উৎপত্তি।
গুণাগুণ : আচার হিসেবে খাওয়া যায়, তাছাড়া অম্লপ্রধান ফল।

সাধারণ নাম : বেল
ইংরেজি নাম : Wood Apple
বৈজ্ঞানিক নাম : *Aegle marmeless (Linn)*
উৎপত্তি : বাংলাদেশে সব জায়গায় জন্মে।
গুণাগুণ : পেটের পীড়া এবং হজমে, শরবত হিসেবে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

সাধারণ নাম : সাগর কলা
ইংরেজি নাম : Banana
বৈজ্ঞানিক নাম : *Musa paradisiaca*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : উচ্চ রক্তচাপ দমনে, বল বাড়ায়, পাকা কলা ব্রেনের জন্য উপকারী।

সাধারণ নাম : কাঁচা কলা
ইংরেজি নাম : Banana
বৈজ্ঞানিক নাম : *Musa paradisiaca*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : কাঁচা কলা রান্না, ভর্তা অথবা নিরামিষ হিসেবে খাওয়া যায়।

সাধারণ নাম : চাপা কলা
ইংরেজি নাম : Banana
বৈজ্ঞানিক নাম : *Musa paradisiaca*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : উচ্চ রক্তচাপ দমনে, বল বাড়ায়, পাকা কলা ব্রেনের জন্য উপকারী।

সাধারণ নাম : জারুল (কাঠ)
ইংরেজি নাম : Jarul
বৈজ্ঞানিক নাম : *Langerstroemia speciosa*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : কাঠ ও আসবাবপত্র তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ নাম : স্বর্ণ চাঁপা
ইংরেজি নাম : Swarnachapa
বৈজ্ঞানিক নাম : *Michelia Champaca*
উৎপত্তি : উপক্রান্তীয় ও মৌসুমি অঞ্চলে পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : উত্তম ও মূল্যবান আসবাবপত্র ফুলের গন্ধের জন্য বাড়িতে লাগানো হয়।

সাধারণ নাম : লজ্জাবতী
ইংরেজি নাম : Sensitive plant
বৈজ্ঞানিক নাম : *Mimosa pudica*
উৎপত্তি : উত্তরবঙ্গ ও আসামে।
গুণাগুণ : হাত-পা জ্বালা, আমাশয়, অশ্বরোগ ইত্যাদি।

সাধারণ নাম : লবঙ্গ
ইংরেজি নাম : Cleve tree/Labanga
বৈজ্ঞানিক নাম : *Eugenia caryophyllus*
উৎপত্তি : ভারত
গুণাগুণ : মাথাব্যথা, গলা খুশখুশ হলে লবঙ্গ খেলে উপকার পাওয়া যায়।

সাধারণ নাম : সাগুপাম
ইংরেজি নাম : Sagupalm
বৈজ্ঞানিক নাম : *Cycus revulut*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : গৃহাঙ্গনের দু'পাশে সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য লাগানো হয়।

সাধারণ নাম : গোল্ডেন শাওয়ার
ইংরেজি নাম : Golden Shower
বৈজ্ঞানিক নাম : *Campris radicans*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : শোভাবর্ধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ নাম : ঘৃতকুমারী
ইংরেজি নাম : Aloe
বৈজ্ঞানিক নাম : *Aloe candelabrum*
উৎপত্তি : আরব, ভারতে।
গুণাগুণ : অশ্বরোগে, একজিমায়, ঋতু বন্ধে, কৃমি ইত্যাদি।

সাধারণ নাম : **গোলাপ (লাল)**
ইংরেজি নাম : Red Rose
বৈজ্ঞানিক নাম : *Rosa centifolia*
উৎপত্তি : ফ্রান্স, ইতালি, বুলগেরিয়া এবং এশিয়া মহাদেশে।
গুণাগুণ : আতর, সুগন্ধি এবং ঘর সাজাতে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ নাম : **গোলাপ (সাদা)**
ইংরেজি নাম : White Rose
বৈজ্ঞানিক নাম : *Rosa centifolia*
উৎপত্তি : ফ্রান্স, ইতালি, উত্তর আফ্রিকা এবং এশিয়া মহাদেশে।
গুণাগুণ : আতর, সুগন্ধি, ফুলের মালা এবং ঘর সাজাতে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ নাম : **গোলাপ (গোলাপি)**
ইংরেজি নাম : Red Rose
বৈজ্ঞানিক নাম : *Rosa centifolia*
উৎপত্তি : ফ্রান্স, ইতালি, বুলগেরিয়া এবং এশিয়া মহাদেশে।
গুণাগুণ : আতর, সুগন্ধি এবং ঘর সজ্জাতে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ নাম : **গোলাপ (কমলা)**
ইংরেজি নাম : Orange Rose
বৈজ্ঞানিক নাম : *Rosa centifolia*
উৎপত্তি : ফ্রান্স, ইতালি, বুলগেরিয়া এবং এশিয়া মহাদেশে।
গুণাগুণ : আতর, সুগন্ধি এবং ঘর সাজাতে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ নাম : **মিনি রঙ্গান**
ইংরেজি নাম : Minirangan
বৈজ্ঞানিক নাম : *Ixora rosea will*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : বাগানের সৌন্দর্য বর্ধন হিসেবে।

সাধারণ নাম : **মানকচু**
ইংরেজি নাম : Mankachu
বৈজ্ঞানিক নাম : *Alocasia indica*
উৎপত্তি : বাংলাদেশসহ ভারতে।
গুণাগুণ : সুস্বাদু, পুষ্টিকর, চাটনি ও আচার এবং অর্শ্বরোগের প্রতিষেধক ও বাতের জন্য ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ নাম : **মাধবীলতা**
ইংরেজি নাম : Madablata
বৈজ্ঞানিক নাম : *Hiptage madablata*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : সৌন্দর্য বর্ধন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ নাম : **অড় বড়ি**
ইংরেজি নাম : Arborai
বৈজ্ঞানিক নাম : *Phyllanthus acidus (Linn)*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : টক ও আচার হিসেবে খাওয়া যায়।

সাধারণ নাম : **চা**
ইংরেজি নাম : Tea
বৈজ্ঞানিক নাম : *Cammellia cinensis*
উৎপত্তি : চীনারাই চায়ের প্রথম ব্যবহারকারী।
গুণাগুণ : দেহের ক্লান্তি, মস্তিষ্কের উত্তেজনা বর্ধক কর্মোদ্দীপনা বৃদ্ধি করে।

সাধারণ নাম : **তেঁতুল**
ইংরেজি নাম : Tamarind
বৈজ্ঞানিক নাম : *Tamarindus indica*
উৎপত্তি : এশিয়া মহাদেশে।
গুণাগুণ : পাথর কয়লার পরিবর্তে জ্বালানি, টক, আচার হিসেবে খাওয়া যায় এবং কাঁচা তেঁতুল গ্যাস্ট্রিক ও আলসার নিরাময় করে।

সাধারণ নাম : **মুশান্ডা (গোলাপি)**
ইংরেজি নাম : Mussaenda Rose
বৈজ্ঞানিক নাম : *Mussaenda grandiflora*
উৎপত্তি : বাংলাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : ঘনসন্নিবিষ্ট পাতা মনোহর।

সাধারণ নাম : **ধুতুরা**
ইংরেজি নাম : Solanaceae
বৈজ্ঞানিক নাম : *Datura fastuosa*
উৎপত্তি : উত্তর আফ্রিকা ও ভারতে
গুণাগুণ : মাদকাসক্তি, স্মৃতিশক্তি কমে যায়, ধ্যান-ধারণা বদলে যায়।

সাধারণ নাম : **থানকুনি**
ইংরেজি নাম : Umbelliferae
বৈজ্ঞানিক নাম : *Centellaasiatica*
উৎপত্তি : এশিয়া মহাদেশের সর্বত্র পাওয়া যায়।
গুণাগুণ : পেটের পীড়া, উদরাময়, আমাশয়, বাত, গ্যাস্ট্রিক, আলসার ইত্যাদি।

সাধারণ নাম : **আমলকী**
ইংরেজি নাম : Amloki
বৈজ্ঞানিক নাম : *Phyllanthus embelica*
উৎপত্তি : বাংলাদেশ ও ভারতের একটি স্থানীয় গাছ।
গুণাগুণ : আলসারের ওষুধ, প্রচুর ভিটামিন 'সি', দন্তরোগ ও চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়।

★ *তথ্য উপস্থাপনকারী জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের লাইব্রেরিয়ান।*

"জুড়ে তব ওই আকাশখানা,
মেলেছি ও বিভু! পাখির দুই ডানা"

মোঃ রিদওয়ানুর রহমান

আমাদের পৃথিবীপৃষ্ঠের হাজার কিলোমিটার উপর থেকে যে শূন্য একটি অঞ্চল পরিলক্ষিত হয় সেখান থেকেই আকাশের সীমানা শুরু এবং এর শেষ যে কোথায় সেটা কেউ জানে না। পুরাকালীন পৌত্তলিক সময়গুলোতে, মানুষ আকাশে পাখিদের দেখে এবং তাদের ওড়ার ধরন পর্যবেক্ষণ করে সর্বদাই মোহিত হতো। সেই সময় পাখিদের বিবেচনা করা হতো আত্মার উড়ন্ত বাহন হিসেবে। এছাড়াও বিশ্বাস করা হতো পাখিরা তাদের দুইটি ডানায় ভর করে আত্মাদের আকাশপথে বহন করে বিভুর স্বর্গপুরীতে নিয়ে যেতে সক্ষম। তথাপি, আমার এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে উদ্ভাবনমূলক এবং রূপকার্থক দৃষ্টিকোণ থেকে পাখির দুইটি ডানা সৃষ্টি করা এবং বিভুর এই বিশাল মহাকাশজুড়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবে যতটা সম্ভব ডানা মেলে ধরার চেষ্টা করা।

জুরাসিক যুগের শেষের দিকে কিংবা আজ থেকে প্রায় পনেরো কোটি বছর আগে এই পৃথিবীর বুকে আরকিওপটেরিক্স (Archaeopteryx) নামক কিছু জীব দেখা যেত। কার্যত, ইংরেজি Archaeopteryx শব্দটি মূলত দুটি গ্রিক শব্দ archeos (আদি) এবং pteryn (ডানা) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে এরাই ছিল পৃথিবীর প্রথম পাখি যারা উড্ডয়নে সক্ষম। প্রকৃতপক্ষে, এরা ছিল সরীসৃপ আর পাখির সমন্বয়। এদের সরীসৃপের মতো দাঁত, লেজ, এবং ডানায় থাবা ছিল। কিন্তু, স্বাভাবিক পাখিদের মতো এদের শরীরের পালকও ছিল। এছাড়া, এরা ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হতো। দুর্ভাগ্যবশত, কালের বিবর্তনে তারা অনেক আগেই আমাদের এই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পরবর্তীতে, আরকিওপটেরিক্সের জীবাশ্ম জার্মানির ব্যাভেরিয়ার বিখ্যাত সোলেন হোফেন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়

অ্যারকিওপটেরিক্সের খুঁজে পাওয়া জীবাশ্ম (বামে) এবং তার প্রকৃত প্রতিমূর্তি (ডানে)

প্রাচীন গ্রিক পুরাণের কাহিনীতে একজন বিখ্যাত কুশলী কারিগর সম্পর্কে জানা যায়, যার নাম ছিল ডীডালাস। একদিন ডীডালাসের এক অন্যায়কর্মের জন্য ক্রীট রাজ্যের রাজা মাইনস কারিগর ডীডালাস এবং ওনার পুত্র ইকারাসকে লেবিরিন্থ নামক গোলকধাঁধায় বন্দী করে রাখেন। পরবর্তিতে, ডীডালাস ওনার উদ্ভাবনী প্রতিভাবলে নিজের তাঁর পুত্র ইকারাসের পাখির পালক ও মোমের সমন্বয়ে দুই জোড়া ডানা তৈরি

করেন যাতে দুজনই ক্রীট রাজ্য থেকে উড়ে পালিয়ে যেতে পারেন। তারপর আকাশে উড়ার সময় পিতা ডীডালাসের সাবধানবাণী অমান্য করে ইকারাস অধিক উচ্চতায় ওড়ার সময় সূর্যের তাপে তাঁর ডানার মোম গলে যায় এবং ডানাবিহীন ইকারাস সমুদ্রের পানিতে পড়ে মৃত্যুবরণ করেন। অপরদিকে, ডীডালাস খুবই সতর্কতার সাথে তাঁর দুটি ডানায় ভর করে ক্রীটরাজ মাইনসের কবল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

পতিত ইকারাস এবং উড়ন্ত ডীডালাস

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কৃত্রিম ডানা নিয়ে কোনো মানুষ কি আকাশে উড়ে বেড়াতে পারে? আমরা জানি, নকল ডানা নিয়ে বাতাসে ভাসা যায়। যেমন প্যারাসুট নিয়ে মানুষ বিমান কিংবা হেলিকপ্টার থেকে নেমে আসে অথবা হ্যাঙ্গ-গ্লাইডার নিয়ে অনেকে হাওয়ায় ভেসে চলে। কিন্তু ঝরা-পালকের ডানা নিয়ে কি আকাশে উড্ডয়ন করা আদৌ সম্ভব? কার্যত, ঝরা-পালক দুই হাতে লাগিয়ে কোনো মানুষ আকাশে উড়তে পারে না। কারণ, পালকের সাথে দেহের পেশি যুক্ত না থাকলে ওড়া সম্ভব নয়। একটা উড়ন্ত পাখিকে ভালো করে দেখলেই তা বোঝা যায়। ওড়ার সময় পাখিরা ডানার পালক এদিক-ওদিক নাড়াতে থাকে। ডানা দুটি নিচে নামানোর সময় বাতাস আটকানোর জন্য পালক সব সমান্তরাল হয়। পরমুহূর্তে, যখনই ডানা উপরে উঠতে শুরু করে পাখির পালকগুলো নব্বই ডিগ্রি ঘুরে যায়। তখন ডানায় আর বাতাস আটকায় না।

যে কারণে মানুষ পাখির মতো আকাশে উড়তে সক্ষম নয়

সত্যি বলতে আকাশে ওড়াটা পাখির জন্যও কঠিন কাজ। খুব দরকার না হলে পাখি আকাশে ওড়ে না। সুযোগ পেলে উপর দিকে ঠেলে ওঠা বাতাসে ভর করে পাখিরা ভেসে থাকে। কেননা ভেসে থাকা সহজ; কিন্তু উড়তে গেলে অনেক পেশিশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয়। বাতাসের দিক ও গতি সময়ে সময়ে বদলায়। পাখিকে সারাক্ষণ সেই পরিবর্তনগুলো মাপতে হয়। ফলে পাখিকে পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো নিয়ে সর্বদা ভাবতে হয়। তারপর পাখিকে তার পেশিতে দ্রুত নির্দেশ পাঠাতে হয়। আকাশে উড়তে হলে সূক্ষ্ম বায়ুমান-যন্ত্র, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, উন্নত স্নায়ু-সংযোগ ও প্রচুর পেশিশক্তি প্রয়োজন হয়। এসব না থাকলে ক্ষুদ্র পতঙ্গের মতো কেবল গাছের আড়ালে, ভূমির কাছাকাছি ওড়া যায়; কিন্তু আকাশ অধিকার করা যায় না।

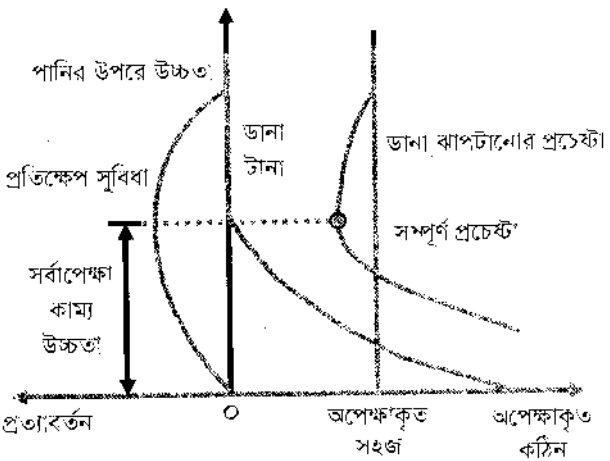

পাখির সাধারণ উড্ডয়ন প্রক্রিয়া

ইংরেজি ৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে, আব্বাস ইবনে ফারনাস নামক একজন স্পেনীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং প্রকৌশলী রেশম ও ঈগলের ডানা দিয়ে একটি যন্ত্র তৈরি করে একটি পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপ দেন। তিনি বেশ উঁচুতে পৌঁছাতে সক্ষম হন এবং প্রায় দশ মিনিট আকাশে অবস্থান করেন। এ ঘটনা প্রত্যক্ষকারী কয়েকজন বিশ্বস্ত লেখকের সাক্ষ্য অনুযায়ী সেই সময় তিনি আসল পাখির মতো উল্লেখযোগ্য দূরত্ব অতিক্রম করেন। কিন্তু যেখান থেকে যিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন পুনরায় সেখানে অবতরণ করতে গেলে উনি ভারসাম্য হারিয়ে পিঠে ভীষণ আঘাত পান। বস্তুত, পাখিরা তাদের পুচ্ছের উপর ভর করে নিচে নেমে আসে। এই বিষয়টি জানা না থাকায় তিনি ওনার যন্ত্রে লেজ তৈরি করেননি।

আব্বাস উড়ন্ত পাখি পর্যবেক্ষণ করেন	আব্বাস যেটা বানাতে ভুলে গেছেন	আব্বাস ভুলবশত যেটা বানিয়েছেন	ফলে আব্বাসের যা পরিণতি হয়েছিল
		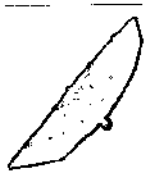	

প্রাচীন গ্রিক পুরাণের কাহিনীতে একটি বিখ্যাত ঘোড়ার সাক্ষাৎ মেলে, যার নাম পেগাসাস। এই ঘোড়াটির দুটি পাখির মতো ডানা ছিল এবং এটি ঘূর্ণিঝড়ের মতো অক্লান্ত ও দুরন্ত গতিতে আকাশে ছুটে বেড়াত। দেবী অ্যাথিনির সাহায্যে বীর বেলেরোফোন এই ঘোড়াটির মালিক হন। কিন্তু কালক্রমে অ্যাথিনির দৈব অনুগ্রহের কথা ভুলে গেলেন বেলেরোফোন। পেগাসাসে আরোহণ করে আকাশ ও মাটি জয় করার আনন্দে এক ধরনের অহংকার জন্ম নিল ওনার মনে। ফলে একদিন ওনার সশরীরে স্বর্গরাজ্য ভ্রমণের বাসনা জাগল। তারপর বেলেরোফোন পেগাসাসের পিঠে চড়ে স্বর্গযাত্রা করলে দেবতা জিউস পেগাসাসের পেছনে একটি ডাঁশ লাগিয়ে দেন। সেই ডাঁশের কামড়ে অস্থির পেগাসাস বেলেরোফোনকে তার পিঠ থেকে ফেলে দেয় এতে দুর্ভাগ্য বীর বেলেরোফেনের অকালমৃত্যু হয়। বেলেরোফোনের মৃত্যুর পর দেবরাজ জিউস পেগাসাসকে নিজের অস্তাবলে রেখে দেন।

গ্রিক পুরানের পেগাসাস

প্রাচীন মায়া সভ্যতার সাংকেতিক লিখনে দুদিকে ডানা মেলে ধরা একটি কাঠঠোকরা পাখির চিত্র দেখা যায়। সেই পাখিটিকে দেখে মনে হয় যেন সে আকাশে আনন্দে উড়ে বেড়াচ্ছে। প্রাচীন মায়ার অধিবাসীগণ সেই কাঠঠোকরার চিত্রটিকে লুব্ধক নামক নক্ষত্র হিসেবে ইঙ্গিত করে থাকে নিজস্ব জ্যোতির্বিদ্যার উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। যেহেতু লুব্ধক জোড়-বাঁধা নক্ষত্র হিসেবে পরিচিত, হতে পারে লুব্ধকের দুটি নক্ষত্রকে নির্দেশ করতে প্রাচীন মায়ানরা দুইটি ডানাযুক্ত কাঠঠোকরাকে তাদের চিত্রলিপিতে ব্যবহার করেছে। পরবর্তীতে, আধুনিক কালের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এই জোড়-বাঁধা নক্ষত্রটিকে Sirius-A এবং Sirius-B নাম দিয়েছেন। এই Sirius A ও Sirius B একে অপরের দিকে ধনুকের রূপে গতিপথ অনুসরণ করে এবং প্রতি ৪৯.৯ বছর পর পর একে অপরের নিকটবর্তী হয়ে আকাশে ঝুলে থাকে। লুব্ধক হচ্ছে নভোমন্ডলের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র। অধিকন্তু, আকাশের নক্ষত্রমালার মাঝে মিথুন রাশিকে চিনতে হলে প্রথমেই লুব্ধকের দুটি নক্ষত্রকে চিনে নিতে হবে। কালপুরুষের বাণরাজা ও আর্দ্রা নামক দুটি নক্ষত্রকে যোগ করে সেই রেখাটিকে যদি উত্তর-পূর্ব বাড়িয়ে দেওয়া হয় তবেই তাদের শনাক্ত করা যাবে।

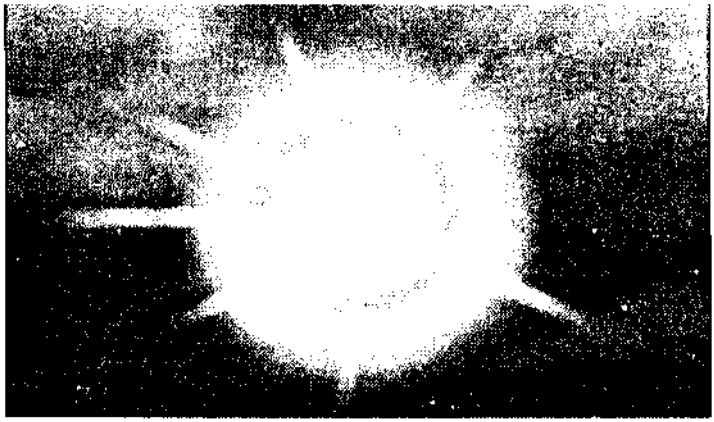

জোড়-বাঁধা নক্ষত্র হিসেবে লুব্ধক

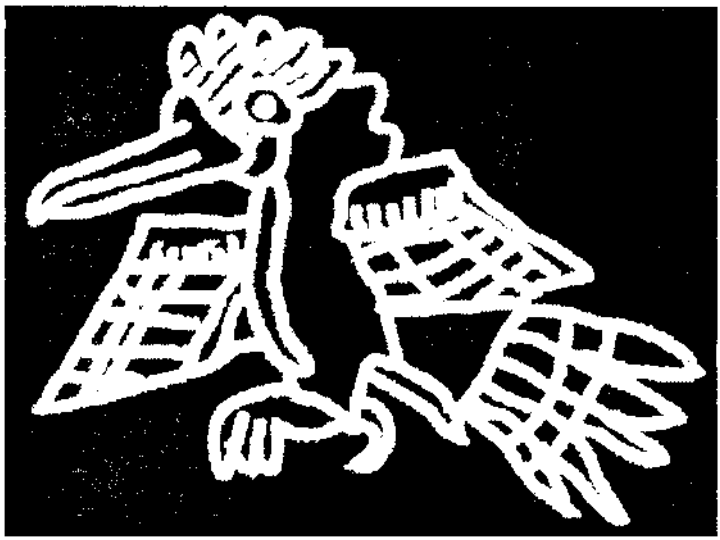

লুব্ধক নির্দেশক ডানা মেলে ধরা কাঠঠোকরা

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে আকাশে যত নক্ষত্র দেখা যায় তাদের মোট চুয়াল্লিশটি নক্ষত্রমণ্ডলে ভাগ করা হয়েছে। যার মধ্যে সর্বমোট বারোটি রাশিচক্র বিদ্যমান। বিভিন্ন নক্ষত্রমণ্ডলে ভাগ করে দেওয়ার ফলে আকাশে লক্ষ লক্ষ পৃথক নক্ষত্রের চেয়ে চুয়াল্লিশটি নক্ষত্রমণ্ডল চিনে নেওয়া নিঃসন্দেহে অনেক সহজ। সে যাই হোক, হংসমণ্ডল হচ্ছে আকাশের সুন্দর নক্ষত্রমণ্ডলগুলোর একটি। এই মণ্ডলটির নক্ষত্রগুলোকে দেখে মনে হয়, সত্যিই যেন একটি উড়ন্ত হাঁসের প্রতিচ্ছবি। তার কারণ হলো, প্রাচীনকালে বিভিন্ন কৌতূহলী মানুষরা আকাশে নক্ষত্রদের চিনতে এক অভিনব উপায় বের করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তারা আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলো নিয়ে বিবিধ ছবির কল্পনা করেছিলেন যাতে সহজেই নক্ষত্রগুলোকে চেনা যায়।

রাতের মহাকাশে নক্ষত্রপুঞ্জের মাঝে হংসমন্ডল

এবার কিছুটা ভিন্ন প্রসঙ্গে আসা যাক, আমরা জানি মহাকাশে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র আছে। আর সেইসব নক্ষত্রের মতো সূর্যও একটি নক্ষত্র, তবে সূর্য আমাদের অত্যন্ত নিকট বলে এত প্রকাণ্ড দেখায়। সূর্য অবিসংবাদিতরূপে একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড বিশেষ। এর পুরোটাই হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসে তৈরি। আমাদের এই পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল। যাই হোক, প্রাচীন অ্যাসিরিয় এবং মিসরীয় সংস্কৃতিতে প্রায়ই পাখির ন্যায় ডানাযুক্ত গোলাকার চাকতি পরিলক্ষিত হয়, যা সর্বদা ডানাযুক্ত সূর্যকে নির্দেশ করে থাকে। এছাড়া, অ্যাসিরিয় ডানাযুক্ত সূর্য সাধারণত সূর্যদেবতা শামাশকে ইঙ্গিত করে এবং মিসরীয় ডানাযুক্ত সূর্য হচ্ছে মূলত সুরক্ষার প্রতীক-চিহ্ন।

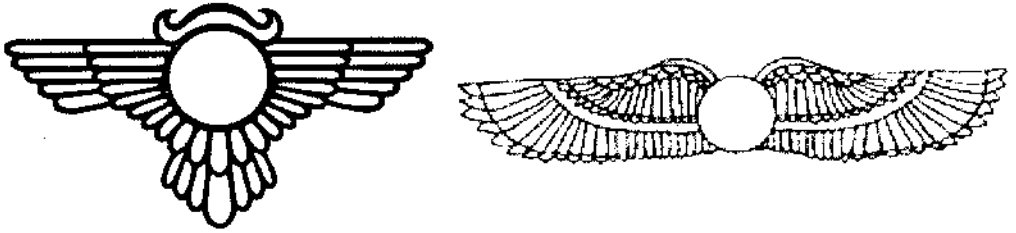

অ্যাসিরিয় ডানাযুক্ত সূর্য (বামে) এবং মিসরীয় ডানাযুক্ত সূর্য (ডানে)

এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন প্রাচীন অ্যাসিরিয় এবং মিশরীয় লোকজন সূর্যের সাথে পাখির সাথে মিল রেখে দুটি ডানা জুড়ে দিত? এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে– পৃথিবীর আবর্তন প্রক্রিয়ায় এক সময় চাঁদ, সূর্য ও পৃথিবী একই রেখায় অবস্থান করতে থাকে। তখন মাঝখানে চাঁদ এসে পড়ায় পৃথিবী থেকে সূর্যের কোনো অংশ দেখা যায় না। বস্তুত, এই ব্যাপারটি এককথায় সূর্যগ্রহণ নামে পরিচিত। মিসরের একজন

প্রয়াত মিসরতত্ত্ববিদ ডক্টর ওসামা আল সাদাওয়ী তার আরবি ভাষায় লেখা Second Real Time Machine নামক বইয়ে দেখিয়েছেন, কেমন করে সূর্যগ্রহণের ফলে আলোক বিচ্ছুরণের মাধ্যমে আকাশে পাখির ন্যায় ডানাযুক্ত সূর্যের প্রতিরূপ সৃষ্টি করে। তাই তার মতে, প্রাচীন সংস্কৃতিতে ডানাযুক্ত সূর্যের প্রতিমূর্তিই হলো সূর্যগ্রহণের আদি এবং আসল মানসচিত্র।

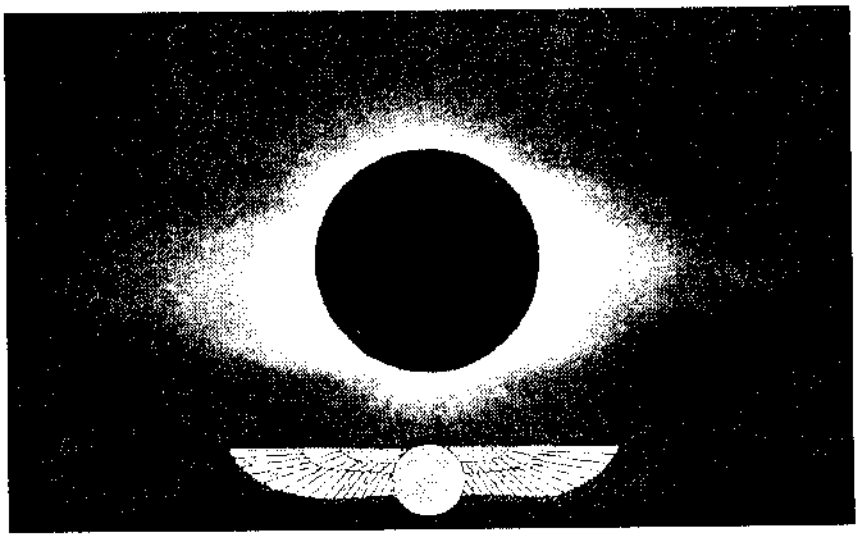

পাখির ন্যায় ডানা মেলে সূর্যগ্রহণ প্রক্রিয়া

শেষ হয়েও হলো না শেষ। ইচ্ছে ছিল বিমান, হেলিকপ্টার, রকেট ইত্যাদি নিয়েও বিজ্ঞানসম্মতভাবে কিছুটা আলোচনা করার। কিন্তু সমস্যা হলো, তারা আদপেই প্রকৃতিদত্ত নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিক। কার্যত, এই প্রবন্ধটিতে পাখির ডানা কিংবা পাখির ন্যায় ডানা সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক আলোচনা কিছু কিছু ক্ষেত্রে পৌরাণিক হলেও সেসব ডানার সুচিন্তিত ধারণাগুলো অনবরত গ্রহণ করা হয়েছে পার্থিব এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানসংক্রান্ত নিদর্শন থেকে, যা আমাদের প্রকৃতির মাঝে অবিসংবাদিতরূপে বিদ্যমান। **(সম্পাদিত)**

★ *প্রবন্ধকার নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর (ইংরেজি) বিভাগের শিক্ষার্থী।*

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি : নতুন বিপ্লবের সূচনা

পপি মন্ডল

"তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি" শব্দটি ১৯৮০-র দশক থেকে শিক্ষায়াতনে গবেষকদের দ্বারা বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দিনে দিনে এর পরিধি বেড়েই চলেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ক্ষুদ্র অর্থে "তথ্য প্রযুক্তি" হিসেবেও গণ্য করা হয়। প্রকৃত অর্থে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি হলো তথ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত একাধিক উপাদানের একটি সম্মিলিত ব্যবস্থা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলতে সাধারণত– যোগাযোগ ব্যবস্থা, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, কম্পিউটার ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সফটওয়্যার, মিডলওয়্যার, স্টোরেজ ও অডিও-ভিজুয়্যাল সিস্টেমের সমন্বিত রূপকে বোঝায়, যা ব্যবহারকারীকে তথ্যে প্রবেশ, সংরক্ষণ, স্থানান্তর এবং স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে ব্যবহার করতে সহায়তা করে।

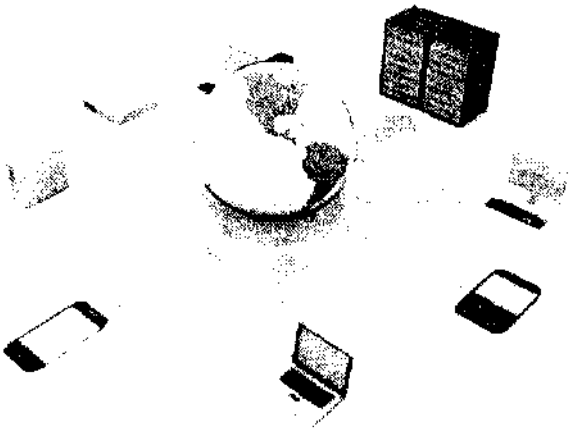

বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে (রেডিও, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার ও নেটওয়ার্ক, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার স্যাটেলাইট সিস্টেম) এবং বিভিন্ন রকম সেবা (দূর পাঠ বা Distance Learning, Video conferencing) ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত। এমনকি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তথ্যসামগ্রী ডিজিটাল ফরম (Digital form) এ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার, ব্যবহারোপযোগীকরণ, হস্তান্তর কিংবা গ্রহণের সাথে জড়িত সকল বস্তুই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (আইসিটি) আওতাভুক্ত।

জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আজ আইসিটির জয়জয়কার। অতিসম্প্রতি বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রযুক্তিতে সম্ভাব্য ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে ৩.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। আবার এ ব্যয় প্রতি ১৫ বছরে বাড়ছে দ্বিগুণ হারে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে উন্নত দেশ হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়ার নাম অগ্রগণ্য। এছাড়া ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া, বাহরাইন, কানাডা, জাপান, চীন, নিউজিল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সুইডেন, আয়ারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, লুক্সেমবার্গ প্রভৃতি দেশও তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ সাফল্য দেখিয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ছোঁয়ায় উন্নয়নের জোয়ার এসেছে সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সৃষ্টি করেছে নতুন বিপ্লবের সূচনা। প্রযুক্তির নতুন নতুন রূপ সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে পরস্পরের সাথে মনোভাব প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো (ফেসবুক, টুইটার) সাধারণ মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ :

শিক্ষাক্ষেত্রে

বর্তমানে কম্পিউটার ছাত্রছাত্রীদের এতটাই মনোযোগ আকর্ষণ করেছে যে, তারা দিন দিন কম্পিউটার কেন্দ্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্থ হয়ে পড়ছে। আধুনিক শ্রেণিকক্ষগুলোতে কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে পাঠদান করা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত না থেকেও পাঠদান কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারছেন। শিক্ষার্থীরা ভিডিও কনফারেন্স বা চ্যাটিং-এর মাধ্যমে ঘরে বসেই লেকচার, নোট ও অন্যান্য পাঠসামগ্রী আত্মস্থ করতে পারে। এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই সময় বাঁচে। বাংলাদেশে বসে শিক্ষার্থীরা এখন লাইব্রেরি অব কংগ্রেসে তার প্রয়োজনীয় বইটি খুঁজে বের করে পড়তে পারে। এছাড়া গবেষকরা অনলাইনে তাদের গবেষণামূলক তথ্য উপস্থাপন করতে পারে এবং পরস্পরের মতামত সাপেক্ষে নতুন তথ্য সংযোজনের মাধ্যমে গবেষণার নতুন ফলাফল অনলাইনে প্রকাশ করতে পারে। তথ্য প্রযুক্তির যুগে ভৌগোলিক অবস্থান কোনো বাঁধা নয়। পৃথিবী এখন বিশ্বগ্রামে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য উচ্চগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়। ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নিজ নিজ জ্ঞান বিনিময়, প্রকাশনা উপস্থাপন, প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় ডাটা পদ্ধতিগতভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিতরণ ও ব্যবহার সহজতর হয়। আন্তর্জাতিক শিক্ষাঙ্গনে অনুপ্রবেশ, আন্তর্জাতিক শিক্ষার মানের সাথে সামঞ্জস্যতা তৈরি, গুণগত শিক্ষা প্রদান ও শেখা, পেশাগত উন্নয়ন এবং সুদক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

কৃষিক্ষেত্রে

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে অনুপ্রবেশের ফলে কৃষকদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটেছে। পণ্যের দাম বিষয়ক তথ্যে অনুপ্রবেশের ফলে কৃষক পণ্যের বর্তমান ন্যায্যমূল্য এবং তার চাহিদা সম্পর্কে জানতে পারছে। তথাপি, কৃষি অর্থনীতিতে কৃষকরা প্রতিযোগিতামূলকভাবে পণ্যের দরদাম নির্ধারণ করতে পারছে এবং এর ফলে তাদের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যোগাযোগ প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় কৃষিভিত্তিক তথ্যের উৎসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সহজ ও সাবলীল ভাষায় কৃষিতথ্য কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। তাছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতার সাথে কৃষকদের যোগাযোগ ত্বরান্বিত করা, কৃষিপণ্য রপ্তানির নিমিত্তে

প্রচার প্রচারণা, অনলাইনে পণ্য কেনাবেচা, ভোক্তা এবং সম্ভাব্য বাজারসুবিধা সম্পর্কে উৎপাদনকারীর সচেতনতা বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তির অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি কৃষককে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের জন্য অনেক শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়, যেখানে রেডিওতে প্রশিক্ষণ বার্তা সম্প্রচার করা হলে এ ব্যয় অনেকাংশে সাশ্রয় করা সম্ভব। এতে একই সময়ে একই তথ্য ভিন্ন ভিন্ন কৃষকের কাছে পৌঁছে যায়। বিভিন্নরকম পরিবেশগত হুমকি যেমন– বন্যা, খরা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, কীটপতঙ্গের উপদ্রব প্রভৃতি কারণে ফসলের অনেক ক্ষতি হয়। আধুনিক যুগে কৃষক প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভর না করে বরং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এসব হুমকির মোকাবেলা করে অধিক ফসল ফলানোয় মনোযোগী হয়েছে। কৃষি উৎপাদনে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার (তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে) কৃষকদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। এর ফলে কৃষিক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে এ কথা দৃঢ়স্বরে বলা যায়।

স্বাস্থ্যসেবায়

তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে চিকিৎসা সেবায় গতি সঞ্চারিত হয়েছে। টেলিফোনে একটি পূর্বনির্ধারিত নম্বর ডায়াল করলেই রোগী এখন ডাক্তারের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারে এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সেবন করতে পারে। সপ্তাহের ৭ দিন ২৪ ঘণ্টা যেকোনো সময়েই রোগী ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত যাবতীয় সরকারি তথ্য এখন মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুস্বাস্থ্য ঝুঁকি বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মীরা নিজেদের সময়োপযোগী করে গড়ে তুলতে এবং রোগীদের উন্নত চিকিৎসাসেবা দিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছে। তাছাড়া হাসপাতালগুলো মানসম্পন্ন ও নিরাপদ স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারছে। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির সাথে বিদেশি চিকিৎসা পদ্ধতির তুলনা করা সহজ হচ্ছে। ফলে আন্তর্জাতিকভাবে আলোচনা, গবেষণা ও পরামর্শের মাধ্যমে অনিরাময়যোগ্য রোগের ঔষধ আবিষ্কারের মাধ্যমে তা নিরাময় করা সম্ভব হচ্ছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষ নিজেদের স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। অনেকসময় একজন সাধারণ মানুষ তার সুস্বাস্থ্যের জন্য কোনটি প্রয়োজন তা সে নিজেই ইন্টারনেটে তথ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানতে পারছে। তাই তথ্য প্রযুক্তির যুগে আমরা স্বাস্থ্যসেবাকে ই-স্বাস্থ্যসেবা বললে অত্যুক্তি হবে না।

ব্যবসা-বাণিজ্যে

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আশীর্বাদে ক্রেতা-বিক্রেতা, ব্যবসায়ী, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা সবাই এখন একটি প্লাটফর্মে মিলিত হয়েছে। দেশে বসে বিদেশি ক্রেতাদের (বায়ার) আকৃষ্ট করার নানা কৌশল রয়েছে ইন্টারনেটে। বাংলাদেশে ব্যবসায়ের প্রভূত সম্ভাবনা থাকায় বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে। আন্তর্জাতিক বাজার এখন টেলিকমিউনিকেশন পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে একদিকে যেমন সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি আগ্রহ বেড়েছে, তেমনি অন্যদিকে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বেড়েছে, বেড়েছে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) ও কনটেন্ট ডেভেলপমেন্টের মতো নানা উদ্যোগ। আর এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নও বেড়েছে এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাই বেকার সমস্যার মতো একটি বড় সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা করা যায়। বর্তমান সময়ে ট্যুরিজম সেক্টরে লাভের সম্ভাবনা সবার নজর কেড়েছে। সম্ভবত রজার হ্যারিসই প্রথম এই সেক্টরে লাভের সম্ভাবনা সকলের সামনে তুলে ধরেন। যা হোক, ইন্টারনেট ও আইসিটি ব্যবহার করে পরিচালকগণ তাদের ট্যুরিজম ব্যবসায়ের উন্নতি করতে পারে, যা তাদের জীবন-মান উন্নয়নেও সহায্য করবে।

ই-গভর্নমেন্টে

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সুশাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তথ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর ই-গভর্নমেন্টে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়, সরকার ও জনগণের মাঝে সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ় হয়, জনগণের চাহিদা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়, চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান করা যায়, সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন করা যায়, ব্যবসায়ীদের সাথে সরকারের সুসম্পর্ক তৈরি হয়, সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায় এবং সরকারের সকল পর্যায়ে সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণ সরকারি আদেশ, বিধি-বিধান, জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ দেশের যেকোনো স্থান থেকে জানতে পারে। ওয়েব পোর্টাল চালু হওয়ায় আন্তঃজেলা যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনলাইনে জেলা পরিচিতি বিদ্যমান থাকায় এক জেলার মানুষ অন্য জেলার ভৌগোলিক ইতিহাস, নামকরণের ইতিহাস, বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, দর্শনীয় ও ঐতিহাসিক স্থান, সীমানা প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে পারে। ই-গভর্নমেন্ট বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডটি 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এ পরিণত হয়েছে। আর এসবই সম্ভব হয়েছে তথ্য প্রযুক্তির সুবাদে। বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ এক নতুন উচ্চতায় আসীন হয়েছে।

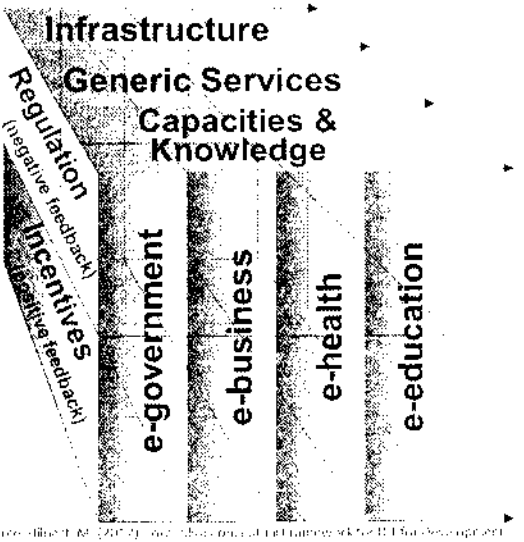

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে

আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ নতুন প্রজন্মের মধ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। নিত্যনতুন প্রযুক্তি আবিষ্কারের মাধ্যমে পুরাতন প্রযুক্তির বিদায় ঘটছে। এসব প্রযুক্তিরর সাথে সাথে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে। সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ মানুষ আইটি সেক্টরে কাজ করছে। এছাড়া অনেক মানুষ প্রযুক্তি বিষয়ক আনুষঙ্গিক কাজ যেমন– উৎপাদন, পরিবহন ও বিপণনে জড়িয়ে আছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বেকারত্বের বোঝা অনেকাংশে লাঘব করেছে। বিদেশে প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন ও দক্ষ কর্মীর বিপুল চাহিদা রয়েছে। তাই প্রযুক্তিক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি করতে পারলে বিদেশেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার, কল সেন্টার ও ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য মানুষ কাজ করছে। তাছাড়া যোগাযোগ প্রযুক্তিতে মহিলাদের অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

পরিবেশ রক্ষায়

সরকার-জনগণ এবং বেসরকারি খাত সকলেই পরিবেশ রক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার, গ্রিন কম্পিউটিং প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন, সম্প্রচার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন এবং প্রকৃতিগত ও মনুষ্যচালিত বিপর্যয়গুলো নিয়ন্ত্রণ– এসকল কাজে আইসিটির ব্যবহারে প্রযুক্তিবিদগণ আগ্রহ প্রকাশ করছে। প্রযুক্তি ব্যবহার করে কীভাবে ভূমিকম্পের আগাম সতর্কতা জানা যায় এবং ভূমিকম্প পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠা যায় তা নিয়ে প্রযুক্তিবিদগণ গবেষণা করে যাচ্ছেন।

নিরাপত্তায়

নিরাপত্তায় এখন উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। এমনকি মানুষের চেয়ে প্রযুক্তিগত নিরাপত্তা এখন বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। অপরাধ জগতেও পাল্লা দিয়ে প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে। গাড়ি, বাড়ি, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ সবক্ষেত্রে নিরাপত্তা রক্ষায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। বাড়িতে কোনোরকম বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ মোবাইলে সংকেত পৌঁছে যায়। আর কে কখন কোথায় অবস্থান করছে তাও জানা সম্ভব হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ফলে। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করা হচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে রোবট ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে ফোনে আড়িপাতার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে রোবট ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে ফোনে আড়িপাতার মতো ঘটনাও ফাঁস হয়েছে। প্রতিটি দেশ তার নিরাপত্তার জন্য নিজস্ব তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বলয় তৈরি করছে।

সবশেষে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি গ্রামীণ জীবনেও গতিশীলতা এনেছে। সমাজের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের সাথে মানুষের সম্প্রীতির বন্ধন তৈরি হয়েছে। দেশ-দেশান্তরে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, আপনজন খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র আইসিটির আশীর্বাদে। বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যতিরেকে আমরা একটা দিনও কল্পনা করতে পারি না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, পরিবেশ, ব্যবসা-বাণিজ্য সবক্ষেত্রেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। তাই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি জীবনের সর্বক্ষেত্রে নতুন বিপ্লবের সূচনা করেছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

★ *প্রবন্ধকার জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের সহকারী লাইব্রেরিয়ান।*

জলবায়ু পরিবর্তন এবং বাংলাদেশ

নুরুন নাহার কবিতা

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন শুধু প্রাকৃতিক কারণেই নয় মানবসৃষ্ট কারণেও ঘটেছে। জলবায়ুতে প্রাকৃতিক কারণে ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি হয়ে নানা পরিবর্তন আসে। তবে বর্তমানে যে জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে তার অধিকাংশই মানবসৃষ্ট কারণ। এর মধ্যে রয়েছে উৎপাদন, পরিবহন, বিপণন, জ্বালানিসহ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার, ভূমি ও বন ব্যবহার ইত্যাদি। এসব কর্মকাণ্ডের ফলে দীর্ঘদিন ধরে উৎসারিত বায়ুমণ্ডলে পুঞ্জীভূত গ্রিন হাউস গ্যাসের কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়ে যাচ্ছে। আবার সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা, হিমালয়ের বরফ গলায় নদীর দিক পরিবর্তন, বন্যাসহ নানাবিধা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশ। আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান জার্মান ওয়াচ-এর ২০১০ সালে প্রকাশিত গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স (cri) অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতির বিচারে শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে প্রথমেই রয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

বৃষ্টিপাত হ্রাস : বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে, ধানের ফুল আসার সময় থেকে বীজ বের হওয়ার মাঝখানের সময়টুকুতে প্রয়োজনের তুলনায় কম বৃষ্টিপাত হওয়ায় টি-আমন জাতের ধানের উৎপাদন কমে আসছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের দেওয়া তথ্যমতে, ২০১০ সালে (৪৭.৪৪৭ মিলিমিটার) বিগত ১৫ বছরের তুলনায় (১৯৯৪ সালের পরে) সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয়েছে। এমনকি এ পরিমাণ শুধু ২০০৯ সালের তুলনায়ই ৯ হাজার মিলিমিটার কম।

লবণাক্ততা বৃদ্ধি : বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ার কারণে নদ-নদীর পানিপ্রবাহ শুকনো মৌসুমে স্বাভাবিক থাকে না। পানির প্রবাহ কম থাকার কারণে সমুদ্রের লোনাপানি স্থলভাগের কাছাকাছি চলে আসছে। উদাহরণে বলা যায়, বরিশাল ও পটুয়াখালীতে লবণাক্ততার পরিমাণ ২ পিপিটি থেকে বেড়ে হয়েছে ৭ পিপিটি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে বৃদ্ধি পেয়েছে নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ তার মধ্যে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদীভাঙন এবং ভূমিধসের মাত্রা বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থা জার্মান ওয়াচের প্রতিবেদন (২০১০) অনুযায়ী ১৯৯০ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বড় ধরনের প্রায় ২৫৪টি দুর্যোগ আঘাত হেনেছে।

অতিবৃষ্টি ও তীব্র বন্যা : বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত তালিকায় বন্যার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ১২টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম। বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণে হিমালয়ের বরফগলা পানিসহ উজানের নেপাল ও ভারতের বৃষ্টিপাতের পানি, বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদ-নদী হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ওয়াটার মডেলিং (IWM)-এর গবেষণা তথ্যমতে, ১৯৯৮ সালের বন্যার পর দেশে বন্যাপ্রবণ এলাকার পরিমাণ ১৮ ভাগ বেড়ে গেছে এবং বর্তমানে পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলের ৩৪টি শহর বন্যার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

অস্বাভাবিক তাপমাত্রা : বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ তাপমাত্রার দেশ হিসেবে পরিচিতি পেলেও বিগত কয়েক বছরে দেশের তাপমাত্রার অস্বাভাবিক আচরণ সেই পরিচিতি ম্লান করে দিচ্ছে। আবহাওয়া অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায় গত ৫০ বছরে দেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ০.৫ ভাগ। এমনকি ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের তাপমাত্রা গড়ে ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ২১০০ সাল নাগাদ ২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বাড়তি তাপমাত্রার কারণে পানির বাষ্পীভবন বেড়ে যাবে এবং বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়িয়ে দেবে, ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশ তথা বিশ্ব।

মরুকরণ : দিন দিন বৃষ্টিপাত কমে যাচ্ছে। সময়মতো বন্যা হচ্ছে না। এমন স্বল্প বৃষ্টিপাত দিন দিন বেড়েই চলেছে। ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে গিয়ে খরায় আক্রান্ত হচ্ছে কৃষিক্ষেত, ফলে খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রায়ই ধেয়ে আসছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি : বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে বাংলাদেশের রয়েছে ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল ভাগ। দ্য সায়েন্টিফিক কমিটি অন এন্টার্কটিক রিসার্চ (SCAIR) জানিয়েছে, যে হারে এন্টার্কটিকার বরফ গলছে, তাতে ২১০০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে প্রায় ৫ ফুট। বিগত দিনের পরিসংখ্যানের প্রায় দ্বিগুণ এ হিসাবের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটেনের 'আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা' (DFID) এ পরিমাণ উচ্চতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত তালিকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে ঝুঁকিপূর্ণ ১২টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান দশম। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে ২০৫০ সাল নাগাদ দেশের প্রায় ৮ ভাগেরও বেশি নিম্নাঞ্চল ও প্লাবনভূমি আংশিক অথবা স্থায়ীভাবে জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে। পথ চলতে চলতে অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে একদিকে শিখতে হবে বেঁচে থাকার কৌশল, অন্যদিকে প্রকৃতির রুষ্ট আচরণ সহনীয় রাখতে গ্রহণ করতে হবে কার্যকরী উদ্যোগ। সচেতনতা আর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কণ্টকমুক্ত করতে হবে আমাদের আগামীর পথচলা। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় বাংলাদেশের মানুষ প্রতিনিয়ত যে সংগ্রাম করে চলেছে সেই সংগ্রামের স্বীকৃতিস্বরূপ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে পরিবেশ বিষয়ে জাতিসংঘের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়নস অব দ্য আর্থ' বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্রহণ করেন। তার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল আশিম স্টাইনার। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিশ্বের দিকে চেয়ে নেই। সীমিত সামর্থ্যের পুরোটুকু ব্যবহার করে নিজেরাই তা মোকাবেলা করছে। একটি বাসযোগ্য পৃথিবী গড়তে অনুন্নত দেশসমূহে টেকসই উন্নয়ন, জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলা করার কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশ এখন এর একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ হাতে কলমে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রদর্শনীসমূহ সাজানো হয়েছে
- বিজ্ঞান শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান জাদুঘর পরিদর্শন আবশ্যক
- কোন প্রতিষ্ঠান থেকে দলগতভাবে জাদুঘর পরিদর্শন করতে চাইলে জাদুঘরের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে পরিবহণ (বিশেষ করে ঢাকা শহরে) ও টিকিটে বিশেষ ছাড় এর ব্যবস্থা রয়েছে
- শিক্ষার্থীদের জাদুঘর পরিদর্শন করার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জাদুঘর কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো

BANSDOC Library Dhaka

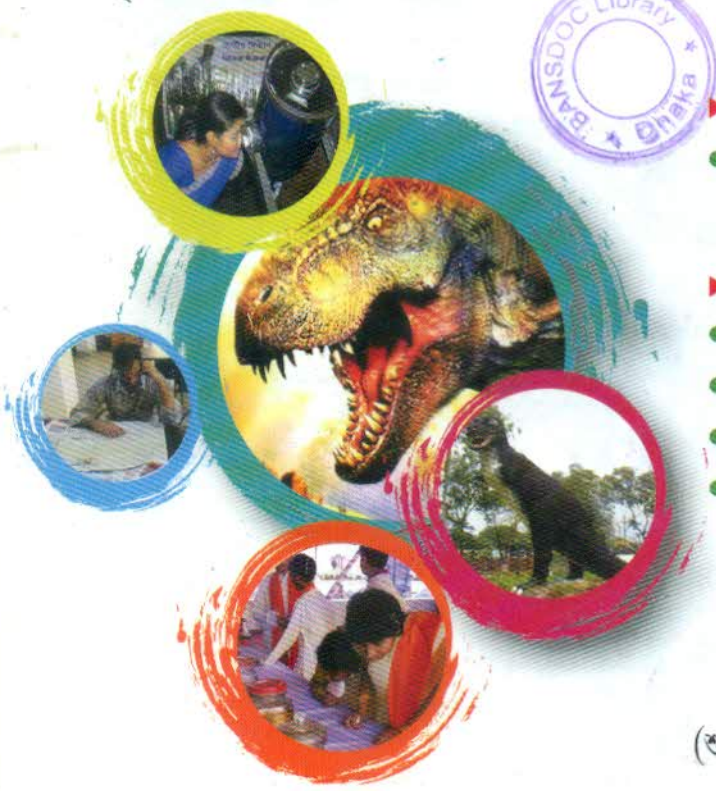

জাদুঘর গ্যালারি পরিদর্শনের সময়

- শনিবার থেকে বুধবার ঃ সকাল ৯-০০ থেকে বিকাল ৫-০০
(শুক্র বার সকাল ১০.০০টা থেকে দুপুর ১২.০০ টা এবং দুপুর ২.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত)

বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক বন্ধ

নিম্নোক্ত বিশেষ দিবসসমূহে জাদুঘর গ্যালারী খোলা থাকে

- মহান স্বাধীনতা দিবস, ২৬ মার্চ
- বাংলা নববর্ষ, ১লা বৈশাখ
- মহান বিজয় দিবস, ১৬ ডিসেম্বর
- জাতীয় শিশু দিবস, ১৭ মার্চ

জাদুঘরে শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে রাতের আকাশ দেখার ব্যবস্থা রয়েছে

(শুক্র ও শনিবার সন্ধ্যার পর ১ ঘন্টা, আকাশ মেঘমুক্ত থাকা সাপেক্ষে)

এখানে স্বল্প দৈর্ঘ্য 4D movie প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

www.nmst.gov.bd

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

ফোনঃ ৯১১২০৮৪, ৯১১৪১২৮